চার পরী
গৌরী সেন

চার পরী

গৌরী সেন

জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

CHAR PARI

Selected Short Story

by Gouri Sen

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৯

প্রকাশক ঃ শান্তনু ভাণ্ডারী

মুদ্রণ ঃ জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স, ৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অলংকরণ ও প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

বারো টাকা

কৌশিক ও অভিষেককে

সূচীপত্র

চার পরী

এক রাজা, তার ছিল সাত রানী। কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। রাজার একটাও ছেলে-পিলে নেই। রাজার সব সময় মন খারাপ। একদিন রাজা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হলেন। যেতে যেতে অনেক দূরে অন্য এক শহরে এসে পৌঁছলেন। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে রাজার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তিনি জল খাবার জন্য চৌরাস্তার একটি মিষ্টির দোকানে এসে দাঁড়ালেন। দোকানে একটি সুন্দর মেয়ে মিষ্টি বিক্রি করছিল। রাজা তার কাছ থেকে মিষ্টি কিনে মিষ্টি খেলেন, জল খেলেন। তিনি মেয়েটিকে মিষ্টির দাম দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন। কিছুদূর যাবার পর রাজা দেখলেন সেই মিষ্টির দোকানের মেয়েটি ঘোড়ার লেজ ধরে তাঁর পিছন পিছন আসছে। রাজা ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, তুমি ঘোড়ার লেজ ধরে আমার পিছন-পিছন আসছ কেন? আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে?" মেয়েটি বলল, "রাজা, আমি একজন খুব ধনী বেনের মেয়ে।

আমার বাবা-মা লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে দুজনেই মারা গেছেন। আমি বিয়ের জন্য কোন ভাল বরই খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি আমাকে বিয়ে করে নিন।"

রাজা বললেন, "কিন্তু আমার ঘরে ত সাতজন রানী আছে। আমাকে বিয়ে করে তোমার কি লাভ হবে?"

মেয়েটি বলল, "রাজা, আমি আপনার এবং আপনার সাত রানীর দিনরাত সেবা করব। আপনি আমাকে আপনার রাজ বাড়িতে নিয়ে চলুন। আর যদি আপনি আমাকে বিয়ে না করেন, নিজের রানী করে না নিয়ে যান তবে আমি আত্মহত্যা করব।"

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর মেয়েটিকে নিজের রানী করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন।

এই মেয়েটি ছিল একটি রাক্ষসী। যেদিন থেকে মেয়েটি রাজপ্রাসাদে এল সেদিন থেকেই সে রাজার কাছে তাঁর সাত রানীর নিন্দা করতে শুরু করে দিল। কিছুদিন পর রাজাও রাক্ষসীর মায়াবীরূপে সব ভুলে গেলেন। তিনি রাক্ষসী রানী যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। তিনি সাত রানীর নিন্দা মন দিয়ে শোনেন। এখন সাত রানী তাঁর চোখের বিষ।

এভাবে কিছুদিন কাটলো। রাক্ষসী রানী বুঝল রাজপ্রাসাদে তার হুকুমেই সব কাজ হচ্ছে। তখন সে করল কি, প্রত্যেক দিন রাতে রাজার আস্তাবলে গিয়ে কোনদিন ঘোড়া আবার কোনদিন রাজার গোয়ালে গিয়ে গরু-বলদ খেতে শুরু করল। প্রায় এক মাসে রাক্ষসী রাজার অনেক গরু-ঘোড়া খেয়ে ফেলল।

কথাটা রাজার কানে উঠল। রাজা খুবই চিন্তায় পড়লেন। প্রত্যেকদিন রাতে কে তাঁর ঘোড়া-গরু খাচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তিনি রাতে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কিছুই হল না, কেউ ধরা পড়ল না। শেষে রাজা ঘোষণা করলেন, "যে আমার ঘোড়া, গরু

বলদ খাচ্ছে তাকে যে লোক ধরে দিতে পারবে আমি তাকে খুব বড় পুরস্কার দেব।"

রাজার এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাক্ষসী রানী একথা শুনে খুব খুশি হল। সে রাজাকে গিয়ে বলল, "রাজা, আমি এ খবর নিশ্চয়ই এনে দিতে পারব। রাজ বাড়ীর ঘোড়া গরু কে খাচ্ছে তাকেও ধরে দিতে পারব। আমাকেই এই কাজের ভার দিন।"

রাজা ত রাক্ষসী রানীর মায়ায় সব ভুলে আছেন। তিনি তখনই সে কাজের ভার তাকে দিলেন। পরদিন রাতে রাজা, রাজ বাড়ির সবাই তখন ঘুমাচ্ছে। গভীর রাত। রাক্ষসী রানী নিজের মহল থেকে বের হল। তারপর আস্তে আস্তে রাজার গোয়ালে এসে চারদিক ভাল করে দেখে নিল। একটা মোটা-সোটা বলদ মেরে তাকে খেল তারপর বলদটার কিছু মাংস আর রক্ত নিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকল।

রাজপ্রাসাদে রাজার সাত রানীও গভীর ঘুমে নিজেদের বিছানায় শুয়েছিল। রাক্ষসী রানী সুযোগ বুঝে সাত রানীর মুখে বলদের রক্ত লাগিয়ে দিল আর অল্প অল্প বলদের মাংস প্রত্যেক রানীর বিছানায় রেখে দিল।

এসব কাণ্ড করে রাক্ষসী রানী সোজা রাজার ঘরে এল। রাজা ঘুমোচ্ছিলেন। রাক্ষসী রানী রাজার ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি রাজাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "রাজা! উঠুন! শীগ্‌গির চলুন! আমি আপনার ঘোড়া-গরু যারা খায় সে-সব রাক্ষসীদের ধরেছি। আপনি আমার সঙ্গে চলুন আমি আপনাকে তাদের দেখিয়ে দেব।"

রাজা তাড়াতাড়ি উঠে রাক্ষসী রানীর সঙ্গে চললেন। রাক্ষসী রানী রাজাকে সাত রানীর মহলে নিয়ে এল, রাজার সাত রানীই ঘুমাচ্ছিলেন। রাক্ষসী রানী সাত রানীর মুখে রক্ত আর বিছানায় মাংসের টুকরোগুলো দেখিয়ে বলল, "রাজা, আপনার সাত রানীই আসলে রাক্ষসী। এরাই আপনার ঘোড়া, গরু-বলদ সব খেয়ে খেয়ে শেষ করছে। রানীর বেশে থাকলেও এই সব রাক্ষসীদের যত শীগ্‌গির সম্ভব রাজপ্রাসাদ থেকে বার করে দিন, তা না হলে এই সাতজন রাক্ষসী একদিন আপনাকে

আর আমাকেও মেরে ফেলবে।"

রাজা রাক্ষসী রানীর কথাই বিশ্বাস করলেন। তিনি সকাল হতেই তাঁর সাত রানীর চোখ তুলে নেবার হুকুম দিলেন। সাত রানী অন্ধ হয়ে গেলেন। তারপর রাজা তাঁর সাত রানীকে রাজপ্রাসাদ থেকে রাস্তায় বার করে দিলেন। রাক্ষসী রানী মহাখুশি।

এদিকে সাত রানী অন্ধ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছেন, এখানে-ওখানে ধাক্কা খাচ্ছেন, মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছেন। এমনি করতে করতে তারা শহরের বাইরে জঙ্গলের কাছে এসে পৌঁছোলেন। জঙ্গলের কাছে এসে সাত রানী একটা ডুমুর গাছের নিচে এসে বসলেন। তারপর তারা ঠিক করলেন এখানেই তারা থাকবেন।

সাত রানীর মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট রানী তার তখন ছেলে-মেয়ে হবার কথা। দিন যায়, মাস যায়, সাত রানী পাকা ডুমুর ফল খেয়ে দিন কাটান আর ভাবেন ছোট রানীর ছেলে হলে, সে বড় হয়ে তাদের দেখাশোনা করবে। তারপর একদিন ছোট রানীর সত্যি-সত্যি একটি ছেলে হল। সাত রানী খুব যত্নে ছোট রানীর ছেলেটাকে মানুষ করতে লাগল। ছেলেটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এখন সে সাত মায়ের একটু-আধটু যত্নও করে।

এদিকে রাজ বাড়ীতে রাক্ষসী রানীরও দুটি ছেলে হল। তারাও বড় হচ্ছে, এদিক-ওদিক খেলা-ধূলা করে, ঘোড়ায় চড়তে শেখে, তীর-ধনুক চালাতে শেখে। একদিন রাক্ষসী রানীর দুই ছেলে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে খেলতে-খেলতে জঙ্গলে এল। ছোট রানীর ছেলেও ঠিক সেই সময় খেলতে-খেলতে সেখানে গিয়ে পেঁছিল। রাক্ষসী রানীর ছেলে দুটি ওকে দেখে অবাক। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে ভাই ? এই জঙ্গলে নির্ভয়ে একলা কি করে ঘুরছ ?" ছোট রানীর ছেলে উত্তর দিল, "আমার নাম বনৈয়া, আমার জন্ম এই জঙ্গলে। আমি সাত মায়ের একটি মাত্র ছেলে। আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই। আমি ত রাতদিন একলা এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, খেলি। তোমাদের দুজনের

হাতে এই নতুন ধরনের খেলনা দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, তোমরা আমাকে ঐরকম একটা খেলনা দিতে পার ?" রাক্ষসী রানীর ছেলেরা বলল, "তুমি ত আচ্ছা বোকা, একি খেলনা নাকি, একে বলা হয় তীর-ধনুক। আর এই তীর-ধনুক রাজাদের জন্য, বীরদের জন্য। জঙ্গলে থাকে এমন ছেলে এটা চালাতেই পারবে না।" বনৈয়া ওদের কথা শুনে দুঃখ পেল। সে তখনই নিজের সাত মায়ের কাছে চলে আসে, বলে, "মা, তোমরা আমাকে একটা তীর-ধনুক দাও।"

তখন সাত রানী বললেন, "বাছা, তুই ত জানিস আমরা সবাই অন্ধ। কোথাও যেতে পারি না। তুই বরং এক কাজ কর, কোন লোহার মিস্ত্রির কাছে গিয়ে একটা তীর-ধনুক তৈরী করিয়ে নে।"

বনৈয়া তখনই একজন লোহার মিস্ত্রির কাছে গেল। সে লোহার মিস্ত্রির কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করে একটা লোহার তীর-ধনুক তৈরী করিয়ে নিল। তার পরদিন থেকেই তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে অভ্যাস করতে শুরু করে দিল। কিছু দিনের মধ্যেই সে খুব ভাল তীর ছুঁড়তে শিখে গেল। এখন সব সময় বনৈয়ার হাতে তীর-ধনুক। সে নিজেকে বীর রাজা ভাবতে শুরু করে দিল।

একদিন হয়েছে কি বনৈয়া এক সঙ্গে দুটি তীর ছেড়েছে ঠিক সেই সময় রাজা ঘোড়ায় করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। বনৈয়ার ছোঁড়া দুটি তীর এসে রাজার দুই চোখে লাগল। রাজা তৎক্ষণাৎ অন্ধ হয়ে গেলেন। রাজা আর কি করেন, তখনই রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। রাজার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে দেখে রাজার লোকজনেরা ছুটো-ছুটি করে কবিরাজকে ডেকে আনল। কবিরাজ এসে কিছুই করতে পারল না। তখন রাজা বললেন, "আমার চোখ যেভাবে নষ্ট হয়েছে তাতে কোন ওষুধেই কাজ হবে না। তবে যদি হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি নামের চার পরীকে ডেকে আনতে পার, তারা এলে নিশ্চয়ই আমার চোখ ঠিক করে দেবে।"

রাক্ষসী রানীর দুই ছেলে রাজাকে বলল, "বাবা, তুমি কিচ্ছু চিন্তা কর না। আমরা দুভাই এখনই ঘোড়ায় করে চার পরীর খোঁজে

যাচ্ছি। এই চার পরী যেখানেই থাকুক না, আমরা তাঁদের খুঁজে আনবই।" একথা বলে রাক্ষসী রানীর দুই ছেলে ঘোড়ায় চড়ে হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি চার পরীর খোঁজে বের হয়ে পড়ল।

যেতে যেতে ওরা ঐ জঙ্গলে এসে হাজির হল। বনৈয়া তখন তীর চালানো অভ্যাস করছিল। দুই ভাইকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে সে বলল, "ও ভাইরা, তোমরা ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলেছ?"

দু'ভাই ঘোড়ার উপর বসে-বসেই রেগে-মেগে উত্তর দিল, "আমরা হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি চার পরীর খোঁজে যাচ্ছি।"

বনৈয়া বলল, "আমাকে তোমাদের সাথে নেবে?"

"যাঃ, যাঃ তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের কি কাজ হবে?"

বনৈয়া বলল, "কত কাজে লেগে যেতে পারি, নিয়ে চল না।"

বনৈয়া বার বার তাদের বলল, তখন তারা বলল, "চল, কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটেই যেতে হবে।"

"আচ্ছা আমি হেঁটেই যাব।"

দু'ভাইয়ের সঙ্গে বনৈয়া যেতে-যেতে এই জঙ্গলটা পার হয়ে অনেক দূর চলে এল। তারপর আর এক জঙ্গলে এসে পৌঁছাল। ঐ জঙ্গলে এক ঘন ঝোপের কাছে একটা মস্ত বড় কুঁয়ো। কুঁয়োর মুখটা একটা শক্ত লোহার ঢাকনা দিয়ে বন্ধ। সেখানে এসে কুঁয়োটার চারদিক ঘুরে বনৈয়া বলল, "এই কুঁয়োর ভিতর হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি চার পরী থাকে।"

দুভাই বনৈয়ার কথা শুনে তাকে খুব বকুনি দিল।

"বোকা, হাঁদারাম তুমি। যদি আমাদের সঙ্গে যেতে হয় তো চল, নয়তো তোমাকে আমরা এখানে ছেড়েই এগিয়ে যাব। পরীরা কখনও কুঁয়োর ভিতর থাকে!"

বনৈয়া বলল, "তোমরা আমার কথা শোন আর নাই শোন, এই চার পরী কিন্তু এই কুঁয়োর মধ্যেই থাকে। আচ্ছা, একবার আমার সাথে এই কুঁয়োর ভিতর ঢুকেই দেখ না।"

বনৈয়ার কথায় তারা দুভাই ঘোড়া থেকে নেমে কুঁয়োর ঢাকনাটা

খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু লোহার ঢাকনা কিছুতেই খুলল না। বনৈয়া তখন তার শক্ত হাতে লোহার ঢাকনাটা খুব জোরে টান দিল, ঢাকনাটা খুলে গেল। বনৈয়ার চেষ্টায় কুঁয়োর ঢাকনা ত খুলল কিন্তু কুঁয়োর ভিতর গিয়ে পরীদের সঙ্গে দেখা করার সাহস রাক্ষসী রানীর দুই ছেলের কারুর হল না। তখন দুভাই বনৈয়াকেই কুঁয়োর ভিতর গিয়ে চার পরীর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলল।

বনৈয়া কুঁয়োর ভিতর যাবার জন্য তৈরী হল। সে তাড়াতাড়ি কুঁয়োর কাছেই যে ঝোপ ছিল সেখান থেকে কিছু লম্বা ঘাস আর কিছু শক্ত লতা নিয়ে এল তারপর সেগুলো দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা লম্বা শক্ত দড়ি তৈরী করল। দু' ভাইয়ের হাতে দড়ির একদিক ধরিয়ে বনৈয়া বলল, "তোমরা দড়ির একটা দিক দুজনে ধরে কুঁয়োর বাঁধানো জায়গায় বসে থাক। আমি দড়ি ধরে নিচে নেমে যাচ্ছি। যেই আমি নিচ থেকে দড়ি দোলাব তোমরা দুজনে তখনই দড়িটা উপরে টেনে নিও। দুভাইকে দড়ির একটা দিক ধরিয়ে বনৈয়া দড়ি ধরে ধরে কয়েকশ গজ গভীরে কুঁয়োর ভিতর চলে এল। আরও নিচে যাবার পর বনৈয়া আবার একটা লোহার ঢাকনা দেখতে পেল। কিন্তু বনৈয়া শক্ত হাতে এক মুহূর্তে ঢাকনাটা খুলে ফেলল। দ্বিতীয় ঢাকনাটা খুলে বনৈয়া আরও কিছুদূর নামল। এবার সে একটি খুব সুন্দর ঝলমলে রাজপ্রাসাদ দেখতে পেল। রাজপ্রাসাদের ভিতর ঢুকে বনৈয়া দেখে একটি সাজানো সুন্দর ঘর, তাতে সিল্কের দড়িতে চারটি দোলনা টাঙ্গানো, হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি চার পরী সেই চারটি দোলনায় বসে দুলছে। বনৈয়াকে দেখে চার পরী দোলনা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা বলল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? তাড়াতাড়ি বল তা না হলে আমরা তোমাকে আমাদের কারাগারে বন্দী করে রাখব।"

বনৈয়া উত্তর দিল, "আমার নাম বনৈয়া। আমি তোমাদের চারজনকে নিতে এসেছি। তোমাদের আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

চার পরী বলল, "এভাবে আমরা ত তোমার সঙ্গে যাব না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে পাশা খেলতে বসতে হবে। যদি তুমি

আমাদের পাশা খেলায় হারাতে পার তবে আমাদের চার জনকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে। তারপর তুমি আমাদের যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাব।”

বনৈয়া তাদের কথায় রাজি হয়ে গেল। পাশা খেলা আরম্ভ হল। সাধারণ মানুষের পক্ষে পাশাখেলায় চারপরীকে হারানো খুব কঠিন ছিল। কিন্তু বনৈয়ার খুব বুদ্ধি। সে বেশ কয়েকবার ওদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে পাশা খেলায় হারিয়ে দিল। চার পরী নিজেরাই হেরে অবাক হয়ে গেল। ওরা অবশ্য বনৈয়ার মত বুদ্ধিমান লোকই খুঁজছিল। চার পরী তখনই সিন্দুরের কৌটা এনে বনৈয়ার সামনে রাখল আর বলল তাদের মাথায় সিঁন্দুর দিয়ে দিতে। বনৈয়া চার পরীর মাথায় সিঁন্দুর দিয়ে দিল, ওদের চারজনের সঙ্গেই বনৈয়ার বিয়ে হয়ে গেল।
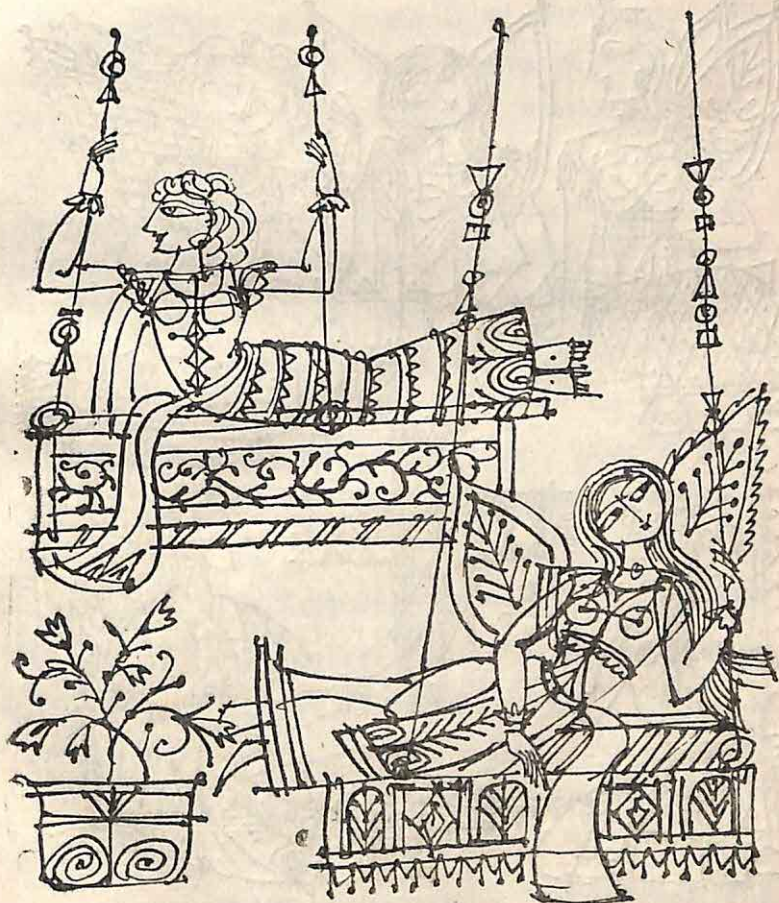
বনৈয়া এবার চারপরীকে নিয়ে কুঁয়োর বাইরে যাবার জন্য তৈরী হল। বনৈয়া খুব জোরে দড়িটা দোলাতে লাগল। কুঁয়োর উপরে রাক্ষসী রানীর তুই ছেলে দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। প্রথমবার হীরাপরী, দ্বিতীয়বার চুন্নিপরী, তৃতীয়বার মণিপরী, সব শেষে মুক্তাপরী এক এক করে দড়ি ধরে উপরে উঠে এল। এবাব বনৈয়াকে তোলার কথা। কিন্তু যখন বনৈয়া দড়ি তুলিয়ে ওকে ওঠাতে বলল তখন রাক্ষসী রানীর তুই ছেলে বনৈয়াকে ত ওঠালই না, সমস্ত দড়ি কুঁয়োর ভিতর ফেলে দিল। বনৈয়া কুঁয়োর ভিতর থেকে গেল। আর এদিকে চার পরীকে সঙ্গে নিয়ে তুই ভাই বাড়ীর দিকে ছুটল।
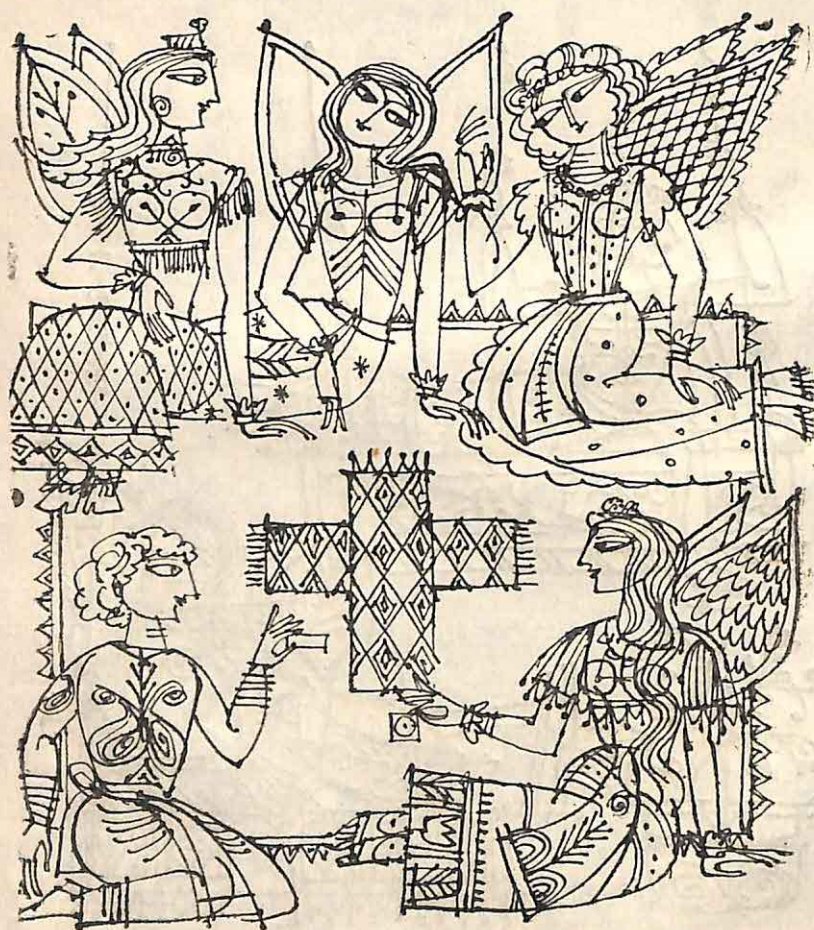
চার পরী বার বার পিছন ফিরে দেখে, কিন্তু ওরা বনৈয়াকে আসতে না দেখে খুব চিন্তায় পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথাবার্তা বলে নিল। চার পরী তারপর নিজেদের চেহারা পাল্টে ফেলল। সুন্দর চারটি পরী হয়ে গেল বিচ্ছিরি, সারা গায়ে ঘা, নোংরা, ঘা থেকে খুব খারাপ গন্ধ বের হচ্ছে, মাছি ভন্‌ভন্ করছে। যে তাদের দেখবে তারই ঘেন্না করবে। রাক্ষসী রানীর দুই ছেলে চার পরীর বিচ্ছিরি চেহারা দেখে, খারাপ গন্ধে থু-থু করতে শুরু করে দিল। তারপর চারজনকে ছেড়ে ওরা পালালো।

বনৈয়া অনেকক্ষণ একলা কুঁয়োর ভিতর চুপচাপ বসে রইল। এদিকে একজন ব্যবসাদার নিজের সব জিনিস বিক্রী করে বাড়ী ফিরছিল। সে অনেকদূর থেকে আসছিল। কুঁয়োটা দেখে সে ওখানে এল। ব্যবসায়ী নিজের গাড়ীর বলদগুলোর গলা থেকে দড়ি খুলে একটার সঙ্গে আর একটা দড়ি জুড়ে একটা মস্ত লম্বা দড়ি তৈরী করল। তারপর দড়িতে ঘটি বেঁধে জল তোলার জন্য কুঁয়োতে ফেলল। কিন্তু কুঁয়োতে জল কৈ, দড়িতে বাঁধা ঘটি অনেক নিচে চলে গেল; একদম কুঁয়োর নিচে রাজপ্রাসাদের সামনে। বনৈয়া সেখানে চুপ করে বসে ছিল। সে দড়ি ও ঘটি খুব ভাল করে ধরল। কিছুক্ষণ পর সে ব্যবসায়ীর দড়ি আর ঘটির সঙ্গে উপরে চলে এল। বনৈয়াকে উপরে উঠতে দেখে ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করল, "ভাই তুমি কে? এই কুঁয়োতে তুমি কি করে পড়ে গেলে?"

বনৈয়া বলল, "আমার সঙ্গে আমার দুজন সঙ্গী ছিল। তারা আমি যখন কুঁয়ো থেকে জল তুলতে যাই, তখন ধাক্কা দিয়ে আমাকে কুঁয়োতে ফেলে দেয়। কুঁয়োতে কিন্তু এক ফোঁটাও জল নেই।"

"তোমার সঙ্গীদের ত দেখছি না?"

"আমার মনে হয় তারা আমাকে কুঁয়োতে ধাক্কা দিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে।" বনৈয়া বলে।

বনৈয়ার সব কথা শুনে ব্যবসায়ীর দয়া হল। সে বনৈয়াকে বাড়ী

ফেরার রাস্তাও দেখিয়ে দিল। বনৈয়া চলেছে। কিছুদূর এগিয়েছে, হঠাৎ চার পরী হীরা, মুক্তা, মণি, চুন্নি তাকে দেখতে পেল।

তারা চট্‌পট্ নিজেদের সুন্দর পরীর চেহারায় পাল্টে নিল। তাদের আর নকল বিচ্ছির চেহারা রইল না। তারা ছুটে বনৈয়ার কাছে চলে এল আর তাকে সব কথা বলল। বনৈয়া চার বৌকে নিয়ে বাড়ী ফিরল।

বনৈয়ার কোন ভাল বাড়ীঘর ছিল না। সাত মাকে রাখার জন্য সে ডুমুর গাছের নিচে ঘাস খড় দিয়ে একটা কুঁড়ে তৈরী করে রেখেছিল শুধু। চার পরী-বৌকে নিয়ে সে তার কুঁড়ে ঘরেই এল। সাত মায়ের খুশির অন্ত নেই কেবল একটিই দুঃখ তাঁরা চার বৌয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁরা যে অন্ধ।

সাত মায়ের দুঃখ দেখে বনৈয়ারও খুব দুঃখ। আর তার দুঃখ দেখে চার পরী বৌয়ের খুব দুঃখ। শেষে চার পরী বনৈয়ার কষ্ট যাতে না থাকে তার জন্য সেদিন রাত্রেই উঠোনে আগুন জ্বেলে মন্ত্র পড়ে খুব নাচল। তখন সেই আগুন থেকে এক সাধু বের হয়ে এল, তিনি বললেন, "বনৈয়ার সাত মায়ের চোখ সাত সমুদ্রের পাড়ে এক রাক্ষসীর কাছে আছে। যদি বনৈয়া সাহস করে সেখানে যেতে পারে তাহলে সে তার সাত মায়ের চোখ ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই পারবে। আমি একটা বানিয়ে টানিয়ে চিঠিও লিখে ওর সঙ্গে দিচ্ছি।"

বনৈয়া হাত জোড় করে সাধুকে বলল, "আমি নিশ্চয়ই সাত সমুদ্র পাড়ে রাক্ষসীর কাছে যাব সাত মায়ের চোখ ফিরিয়ে আনতে। চিঠিটা আমাকে দিন।"

সাধু বললেন, "দেখ তুমি যখন সেখানে পৌঁছবে রাক্ষসী তোমাকে খেতে ছুটে আসবে। তুমি বলবে, 'প্রণাম মাসীমা, প্রণাম মাসীমা।' আর নিজের পরিচয় দেবে রাক্ষসী রানীর ছেলে বলে।" একথা বলতে বলতে সাধু আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

বনৈয়া তখনই সাত সমুদ্রের পাড়ে রাক্ষসীর কাছে রওনা হল।

যেতে, যেতে অনেক কষ্টে বনৈয়া শেষে রাক্ষসের দেশে গিয়ে পৌঁছল। আর তাকে দেখেই সে দেশের সব রাক্ষস ছুটে এল। সবচেয়ে আগে বুড়ী রাক্ষসী "হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

বনৈয়া তৈরীই, সে বলল, "মাসীমা প্রণাম, মাসীমা প্রণাম। আমাকে চিনতে পারছ না মাসীমা, আমি যে তোমার বোনপো, রাক্ষসী রানীর ছেলে। রাক্ষসী থমকে দাঁড়াল। সত্যি ত তার এক বোন রাজরানী হয়ে আছে। অনেকদিন সে বোনের খবর পায়নি। সে সব রাক্ষস-রাক্ষসীদের চলে যেতে বলল। বনৈয়া তাড়াতাড়ি সাধুর লেখা চিঠিটা রাক্ষসীর হাতে দিয়ে বলল, "মা তোমার খবর নেবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। এই নাও মায়ের চিঠি।"

চিঠি পড়ে রাক্ষসী বুঝল এ তার সত্যি বোনপো। তারপর কি আদর, "বৌয়া, আঁহা নিক্কেছি না?" "অর্থাৎ, বাছা, তুমি ভাল আছ ত?" বলে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে বনৈয়াকে কোলে তুলে নিল। তারপর নিজের বোনের খবরাখবর নিতে লাগল। রাক্ষসী বনৈয়াকে নিজের সুন্দর বাড়ী নিয়ে এল, খুব করে খাওয়ালো। বনৈয়া খুব যত্নে, খুব আরামে রাক্ষসীর বাড়ীতে আছে। দ্বিতীয় দিন, রাক্ষসী তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে খাবার-দাবারের খোঁজে বের হবার আগে বনৈয়াকে বলল, বাছা, আমি ত বাইরে যাচ্ছি, তোমার জন্য খাবার-দাবার রইল। তুমি খেয়ে নিও। আর দেখ, তুমি বাড়ীর সব ঘরে যেও কেবল ঐ দক্ষিণ দিকের ঘরটাতে যেও না।"

"কেন, কেন মাসী?" বনৈয়া প্রশ্ন করল।

রাক্ষসী বলল, "এমন কিছুই নেই, চল তোমাকে দেখিয়ে দি ঘরের মধ্যে কি আছে আর কেন মানা করছি ও ঘরে যেতে তাও বলে দি।" বনৈয়া রাক্ষসীর সঙ্গে দক্ষিণের ঘরে এল। রাক্ষসী চারটি ঝোলা দেখিয়ে বলল, "ওরে পাগল ছেলে দেখ, এই যে চারটি ঝোলা এর মধ্যেই আমার সব শক্তি। এর ভরসাতেই আমি আমার সঙ্গী রাক্ষস-রাক্ষসীরা সাত সমুদ্র-পাড়ে নির্জন দ্বীপে থাকি।"

বনৈয়া জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ মাসী কি আছে এই ঝোলাগুলোতে,

যার জন্য তুমি বলছ এগুলো তোমার সব শক্তি ?”

“প্রথম ঝোলাতে আছে ঝড়। ঝোলটা উল্টে ঝেড়ে দিলে প্রচণ্ড ঝড় উঠবে, দ্বিতীয় ঝোলাতে আছে বৃষ্টি ওটা উল্টে ঝেড়ে দিলে প্রবল বৃষ্টি নামবে, তৃতীয় ঝোলাতে আছে আগুন ওটা উল্টে ঝেড়ে দিলে চারদিকে প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠবে। সে আগুনের মধ্যে দিয়ে আমরাও পার হতে পারি না, মানুষ ত পারবেই না। আর চার নম্বর ঝোলাতে আছে চোদ্দটি চোখ। আমার রাক্ষসী রানী বোনের সাত সতীনের চোদ্দটি চোখ। প্রথম তিনটি ঝোলাতে এমন ক্ষমতা আছে বলেই না আমাদের কোন ভয় নেই। তাই বলছিলাম এ ঘরটায় ঢোকার তোমার কোন দরকার নেই। খুব ভাল করে থাকো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারব ফিরে আসব সোনা।”

বনৈয়া কাঁদো-কাঁদো গলায় ইচ্ছে করেই বলে, “তুমি না থাকলে আমার একটুও ভাল লাগবে না মাসী। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস কিন্তু।”

বুড়ী রাক্ষসী তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বনৈয়া দক্ষিণ-ঘরের দরজা খুলে চারটি ঝোলা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটল।

কিন্তু বুড়ী রাক্ষসীর মাঝপথেই প্রাণটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। সে তার রাক্ষুসে চোখ দুটো বনবন করে ঘুরিয়ে দেখে নিল যে বনৈয়া তার ঝোলা নিয়ে পালাচ্ছে। রাক্ষসী বুঝল বনৈয়া তার বোনপো নয়, রাক্ষসী রানীর ছেলে নয়। সে মিথ্যা কথা বলেছে। রাক্ষসী তখনই ছুটল বনৈয়ার পিছনে। প্রায় ধরে ফেলেছে, বনৈয়া তাড়াতাড়ি প্রথম ঝোলাটা উল্টে দিল। ঝড় উঠল, ভীষণ ঝড়। বুড়ী রাক্ষসী ঝড়ের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, বনৈয়া আবার অনেকদূর এগিয়া গেল। কিন্তু সেই ঝড় থামলে বুড়ী রাক্ষসী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল বনৈয়ার কাছে। বনৈয়া দ্বিতীয় ঝোলাটা উল্টে দিল। কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি, চারদিক জলে ভেসে যাচ্ছে। বুড়ী রাক্ষসী তাড়াতাড়ি এগোতে পারছে না। মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। বনৈয়া

এই সুযোগে ছুটল, এগিয়েও গেল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল। বুড়ী রাক্ষসী এবার আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বুড়ী রাক্ষসীর পিছন পিছন ওর সাঙ্গপাঙ্গ অন্য সব রাক্ষস-রাক্ষসীরাও আসছে। কি আর করে বনৈয়া, এবার আর রক্ষা নেই। বনৈয়া তাই তৃতীয় ঝোলাটা

উল্টে ঝেড়ে দিল। আগুন, ভীষণ আগুন জ্বলে উঠল চারদিকে আর সেই আগুনে বুড়ী রাক্ষসীও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সব পুড়ে মরল। বনৈয়া এবার নিশ্চিন্ত মনে সাত মায়ের চোখ নিয়ে বাড়ী এল।

চার পরী বলল, তোমাকে এখনই সাত গ্রামের গরুর দুধ নিয়ে আসতে হবে। কারণ দুধে ভিজিয়ে সাত মায়ের চোখ লাগাতে হবে। বনৈয়া তখনই দৌড়ে সাত গ্রামের গরুর দুধ জোগাড় করে আনলো। সেই দুধে ভিজিয়ে চার পরী সাত মায়ের চোখ লাগিয়ে দিল। সাত মায়ের চোখ ঠিক হয়ে গেল। সাত মা তাদের একমাত্র ছেলে বনৈয়া আর চার পরী বৌদের অনেক আদর করল। শুধু দুঃখ করে সাত মা বলল, "বাছা তুমি এমন সুন্দর সুন্দর চারটি বৌ নিয়ে এলে কিন্তু এরা আমাদের কুঁড়ে ঘরে কেমন করে থাকবে ?"

ওরা বলল, "মা, আপনারা কোন চিন্তা করবেন না, দেখুন না, আমরা একমুহূর্তে সুন্দর রাজপ্রাসাদ তৈরী করে ফেলব।" ঠিক তাই। একটু পরেই ঐ কুঁড়ে ঘরের জায়গায় সুন্দর রাজপ্রাসাদ তৈরী হল। বনৈয়া তার সাত মা আর চার পরীবৌ নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকতে লাগল। কিন্তু বনৈয়া তার চার পরীবৌদের বলল, "রাজপ্রাসাদ ত তোমরা তৈরী করলে, কিন্তু এই রাজপ্রাসাদ সাজাব তার টাকা কোথায় আমার কাছে ?"

হীরা পরী বলল, "আমি হাসলে হীরা ঝরে।" মুক্তা পরী বলল, "আমি হাসলে মুক্তা ঝরে।" মণি পরী বলল, "আমি হাসলে মণি ঝরে। চুন্নি পরী বলল, আমি হাসলে চুন্নি ঝরে।" চার পরী একসঙ্গে হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে আর হীরে, মুক্তা, মণি আর চুন্নিতে ঘর ভরে গেল। বনৈয়া এখন মস্ত বড় রাজা।

কিছুদিন পরে বনৈয়ার রাজার চোখের কথা মনে পড়ল। ওর মনে হল তার তীরেই রাজার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর অন্ধ রাজার চোখ ভাল করার জন্যই সে হীরা, চুন্নি, মণি আর মুক্তা চার পরীকে আনতে গিয়েছিল। এখন ত চার পরী তার বাড়ীতেই আছে।

বনৈয়া সেদিনই রাজবাড়ী গিয়ে রাজাকে নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল।

অন্ধ রাজা বনৈয়ার বাড়ী এলেন। বনৈয়া হীরা, মণি, মুক্তা আর চুন্নি পরীকে রাজার চোখ ভাল করে দিতে বলল। চার পরী অন্ধ রাজাকে একটা খাটে বসাল। তারপর চার পরী খাটের চার পায়ার পিছনে লুকিয়ে চারটি আলোর ধারা অন্ধ রাজার হুচোখে ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই রাজার চোখ আপনি ঠিক হয়ে গেল।

রাজা খুব খুশি! এদিকে চার পরীও খাটের চার পায়ার পিছন থেকে বের হয়ে এল। রাজা বনৈয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কার ছেলে জানি না। তুমি চার পরীকে এখানে কি ভাবে আনলে?"

বনৈয়া উত্তর দিল, "আমি কার ছেলে, সে কথা ত আমার মায়েরা বলবেন। আপনি বস্থন, আমি তাঁদের ডেকে আনছি।"

সাত রানী ঘরে এসে রাজাকে দেখেই চিনতে পারলেন আর রাজাও তাঁদের চিনতে পেরেছেন। তখন চার পরী বলল, "এই সাতজনই আপনার রানী, নিশ্চয়ই এদের চিনতে পারছেন। এদের চোখ আপনি তুলে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার ছেলে বনৈয়ার শক্তিতেই ওরা নিজেদের চোখ ফিরে পেয়েছেন। আর আমরা—হীরা, মণি, মুক্তা, চুন্নি—চার পরীকে বনৈয়া গভীর কুঁয়ো থেকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমাদের জন্য আপনিও নিজের চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন। আর আপনার ঘরে যে রানী হয়ে বসে আছে সে আসলে রাক্ষসী। তার হুই ছেলেও রাক্ষস। আপনাকে যে কোনদিন ওরা খেয়ে ফেলবে।"

এরপর রাজা বনৈয়ার কাছে, নিজের সাত রানীর কাছে এতদিনের সব কথা ধীরে ধীরে শুনলেন। তাঁর নিজের কাজের জন্য খুব হুঃখ হতে লাগল। তিনি তাঁর সাত রানীর কাছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। বনৈয়াকে নিজের বুকে টেনে নিলেন। ছেলের চার পরীবৌকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করলেন। তারপর রাজা নিজের

সাত রানী, ছেলে বনৈয়া আর ছেলের চার পরীবৌকে নিয়ে নিজের রাজপ্রাসাদে এলেন।

রাজপ্রাসাদে এসেই রাজা হুকুম দিলেন তাঁর রাক্ষসী রানী আর তার দুই ছেলেকে মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে।

এরপর রাজা ও সাত রানী খুব সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। কারণ বনৈয়ার সাহস ও শক্তিতে রাজ্যের সব জায়গায় শান্তি। আর ছেলের চার পরীবৌয়ের গুণে প্রজাদের কোন দুঃখ-কষ্ট নেই।

দুষ্টু সদাগর

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব ভাল। নিজের প্রজাদের সুখ-দুঃখ জানার জন্য তিনি রোজ রাজসভায় এসে বসতেন। আর সেই সভায় প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসত আর সুবিচার নিয়ে বাড়ী ফিরে যেত। কিছুদিন ধরে রাজা দেখেন তাঁর রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ রোজ আসেন কিন্তু কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ ফিরে চলে যান। শেষে একদিন থাকতে না পেরে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর, আপনি এভাবে রোজ আসেন আর চুপচাপ চলে যান, আপনি কে? এর কারণ বা কি?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি একজন ব্রাহ্মণ। আপনার একটি ভীষণ বিপদ আসছে, সে কথাটা জানাতে আমি রোজ আপনার সভায় আসি কিন্তু আপনি কাজে ব্যস্ত দেখে কিছু না বলেই চলে যাই। আজ কিন্তু সে কথা বলতেই হবে। আগামীকাল সকাল হবার আগেই প্রচণ্ড ধ্বস নেমে আপনার সমস্ত রাজ্যটি পৃথিবীর নিচে চলে যাবে। কয়েকদিন

দেরি ছিল তাই আমি আপনার রাজসভায় এসেও ফিরে চলে গিয়েছি। কিন্তু আজ আর সময় নেই। যদি আপনি এ রাজ্য ছেড়ে সকালের আগেই না চলে যান তবে ঐ ধ্বসের সঙ্গে আপনিও পৃথিবীর নিচে চলে যাবেন।”

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনে তাড়াতাড়ি অন্দরমহলে গেলেন। তাঁর ছোট দুটি ছেলে ছিল। রাজা তাঁর রানী আর ছেলে দুটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে এলেন।

রাজা তাঁর রানী আর ছোট-ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা রাজ্যের সীমার বাইরে চলে এলেন। ছেলে দুটির খুব ক্ষিদে পেয়েছে। রাজা একটা গাছের নিচে ছেলেদের বসিয়ে রানীকে বললেন, “তুমি ছেলেদের নিয়ে একটু বস। আমি বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি।”

একথা বলে রাজা ছোট একটা বাক্স খুলতে লাগলেন। এই বাক্সটা রাজা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এই বাক্সে সাতটা মণি ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড, ঐ সাতটা মণিই গলে জল হয়ে গেছে। মণিগুলোর অবস্থা দেখে রাজা বললেন, “রানী দেখ, এই বাক্সে সাতটা মণি ছিল কিন্তু সব গলে জল হয়ে গেছে। এখন ছেলে দুটোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করে হবে?”

মণিগুলো গলে গেছে দেখে রানীরও খুব দুঃখ হল। কিন্তু ছেলেদের খাওয়ার তো কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। রানী নিজের গলার হার খুলে বললেন, “রাজা, মনে হচ্ছে আমাদের উপর আরও বড় বিপদ আসছে। তা না হলে সাত-সাতটা মণি গলে জল হয়ে যায়! আমার কাছে শুধু এই হারটা আছে। এটা বাজারে বিক্রি করে ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।”

রাজা হার নিয়ে বাজারে গেলেন। তিনি অনেক দোকানে হারটা দেখালেন কিন্তু এত দামী হারের দাম কোন দোকানদারই দিতে পারে না। শেষে রাজা হার নিয়ে ফিরে চলে এলেন এবং রানীকে বললেন,

"এত দামী হার তো বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।"

রানী বললেন, "রাজা, এখন আমরা কি করব? বাক্সের সাতটা মণিও গলে জল। আমার কাছে তো আর কিছুই নেই। এক কাজ করা যাক, আমি অন্য কোন বাজারে গিয়ে কম দামে হারটা বিক্রি করে আসি। তুমি কিছুক্ষণ ছেলে দুটোর কাছে বস।" একথা বলে রানী হারটা নিয়ে অন্য বাজারের খোঁজে চললেন। কিছুদূর যাবার পর রানী দেখেন একটা নদী। নদীর ওপারে গেলে বড় বাজার পাওয়া যাবে কিন্তু পারাপারের কোন নৌকা না দেখে রানী নদীর পাড়েই বসে পড়লেন এবং নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রানীর এক এক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল এক বছর। কিছুক্ষণ পর একটা বড় নৌকা আসতে দেখে রানীর মনে একটু আশা হল। নৌকা কাছাকাছি আসতেই রানী বললেন, "ভাই, আমায় নদীর ওপারে যেতে হবে, যদি তুমি আমাকে দয়া করে নিজের নৌকায় করে ওপারে পৌঁছে দাও তবে খুবই উপকার হয়।"

নৌকা যার সে বলল, "আমি তো নিজের নৌকা পাড়ে নিয়ে যাব না। আমি একজন সদাগর। আমার নৌকায় লক্ষ টাকার জিনিস আছে। যদি পাড়ে নিয়ে গেলে আমার নৌকা ডুবে যায় এরজন্য কে দায়ী হবে?"

রানী বললেন, "যদি আপনি মস্তবড় সদাগর তবে তো আপনার কাছে অনেক টাকা আছে। আমার এ হার সাত লক্ষ টাকার। আপনিই এ হার নিয়ে আমাকে টাকা দিয়ে দিন। আমার দুই ছেলে এবং স্বামী গাছের নিচে না খেয়ে বসে আছে।"

সদাগর খুব শয়তান। রানীর দামী হারটা দেখে তার খুব লোভ হল। সে হার কেনার ছল করে পাড়ে নৌকা নিয়ে এল আর রানীকে নৌকায় ডেকে আনল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকা চলতে লাগল।

রানী খুব চিৎকার করলেন। নদীর পাড়ে, চারদিকে কেউ নেই, কে

তাঁর চীৎকার শুনবে। সদাগর রানীকে নৌকার মধ্যে একটা ছোট্ট ঘরে বন্ধ করে রেখে দিল। তারপর অনেকদূরে বাণিজ্য করতে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে গাছের নিচে তুই ছেলেকে নিয়ে রাজা রানীর জন্য বসে আছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল রানী যখন ফিরে এলেন না, ছেলেরা খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে, রাজা তখন ছেলেদের নিয়ে যেদিকে রানী গিয়েছিলেন সেদিকে চললেন।

কিছুদূর যাবার পরই তারা নদীর কাছে এসে পড়লেন। কিন্তু কোন নৌকা দেখতে পেলেন না। রাজা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে রাজা ঠিক করলেন একটি ছেলেকে পিঠে করে সাঁতরে ওপারে নিয়ে যাবেন, পরে ফের এপারে এসে অন্য ছেলেটিকে নিয়ে যাবেন। বড় ছেলেকে রাজা পাড়ে বসিয়ে ছোট ছেলেকে পিঠে নিয়ে সাঁতরে নদী
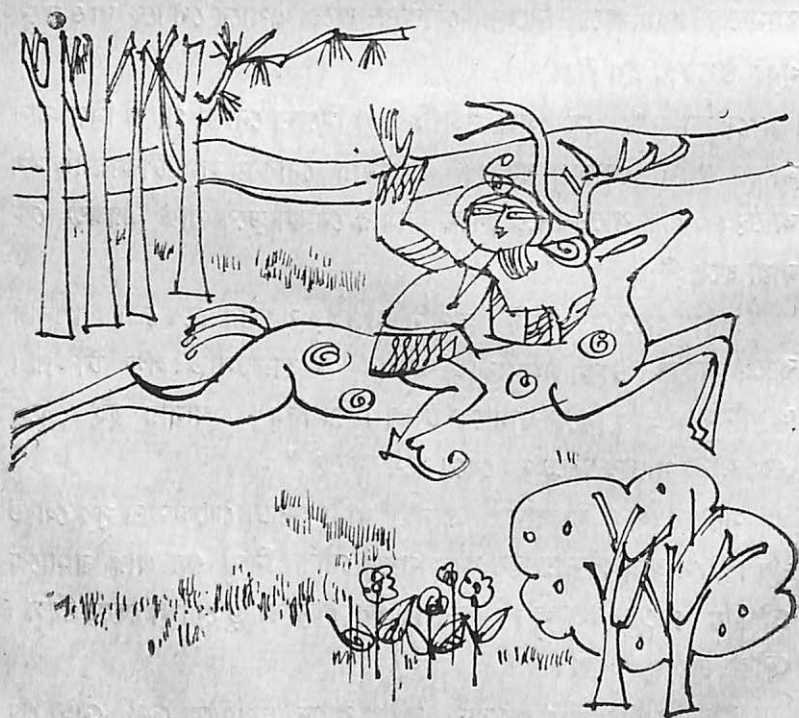
পার হতে লাগলেন। কিন্তু যেই রাজা নদীর অর্ধেক সাঁতরে এসেছেন এমন সময় একটা হরিণ এসে বড় ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। রাজার ছোট ছেলে, যে রাজার পিঠে ছিল, সে বড়ভাইকে হরিণ নিয়ে পালাচ্ছে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠল, "বাবা, বাবা, তাড়াতাড়ি সাঁতরে পাড়ে ফিরে চল, দাদাকে হরিণ নিয়ে পালাচ্ছে।"

রাজা ছোট ছেলের একথা শুনে যেই পিছন ফিরে দেখতে গেছেন, পিঠ থেকে পিছলে ছোট ছেলেটি জলে পড়ে গেল। রাজা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোথাও খুঁজে তাকে পেলেন না।

রাজা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখের সামনেই তাঁর দুটি ছেলেকেই কেউ যেন কেড়ে নিল।

দুঃখী রাজা কোনরকমে সাঁতরে নদীর পাড়ে এলেন। তাঁর কাছে সব অন্ধকার, রাজ্য গেল, রানী গেল, শেষে ছেলে দুটি যাদের দেখে তিনি বাঁচবেন ভেবেছিলেন তারাও হারিয়ে গেল। রাজা নদীর পাড়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষে অন্য এক রাজার দেশে এলেন। ঐ দেশের রাজা খুব আরামে থাকতে ভালবাসতেন। রাজ্যের কাজকর্ম তাঁর ভাল লাগত না। ঐ রাজার কাছে গিয়ে প্রথম রাজা চাকরী নিলেন। দ্বিতীয় রাজাও এরকম একজন যোগ্য কাজের লোক খুঁজছিলেন যে তাঁর রাজ্যটি সুন্দরভাবে চালাতে পারে। প্রথম রাজা দ্বিতীয় রাজার কাজকর্ম খুব সুন্দরভাবে করতে লাগলেন। দ্বিতীয় রাজা খুব আরামে দিন কাটান।

একদিন দ্বিতীয় রাজা একলা ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে শিকার করতে গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন একটা হরিণের পিঠে একটি ছেলে। তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে হরিণের পিছনে ঘোড়া ছোটালেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি হরিণটাকে শিকার করে ফেললেন। রাজা ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। দ্বিতীয় রাজার কোন ছেলেপিলে ছিল না। তাই খুব খুশি মনে ছেলেটিকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করবেন ভেবে তাকে নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে রওনা হলেন। কিছুদূর যাবার পর তাঁর খুব তেষ্টা পেল। তিনি জল খাবার

জন্য নদীর কাছে এলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন নদীর পাড়ে জলের ধারে একটি ছেলে পড়ে আছে। ছেলেটিকে দেখে রাজা এবারও খুব খুশি হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, "আমার একটাও ছেলে ছিল না, আর আজ আমাকে ভগবান দয়া করে দু-দুটো ছেলে দিলেন।"

রাজা দুটি ছেলেকে নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এলেন। তারপর তাদের নিজের ছেলের মত করে মানুষ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে দুটি ছেলেই বড় হতে লাগল। রাজা তাদের নানা বিদ্যা শেখাতে লাগলেন। যাতে তারা বড় হয়ে খুব ভাল করে রাজ্য চালাতে পারে।

এদিকে রাজ্যের সব কাজ প্রথম রাজাই করেন। দ্বিতীয় রাজা নিশ্চিন্ত আরামে আছেন। একদিন দ্বিতীয় রাজা রাজসভায় গান-বাজনার ব্যবস্থা করলেন। বেশ কিছু গায়ক আর যারা ভাল বাজনা বাজাতে পারেন তাঁদের ডেকে পাঠালেন। সেদিন রাতে অনেক দূর দূর থেকে লোকজন এল রাজসভায় গান শুনতে।

এদিকে সেই যে সদাগর, যে রানীকে নৌকার একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করে রেখেছিল সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে ফিরছিল। রাত হয়ে গেছে, তাই সে দ্বিতীয় রাজার রাজ্যের নদীর পাড়ে নিজের নৌকা বেঁধে রাখল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শহরে একটু ঘুরতে গেল।
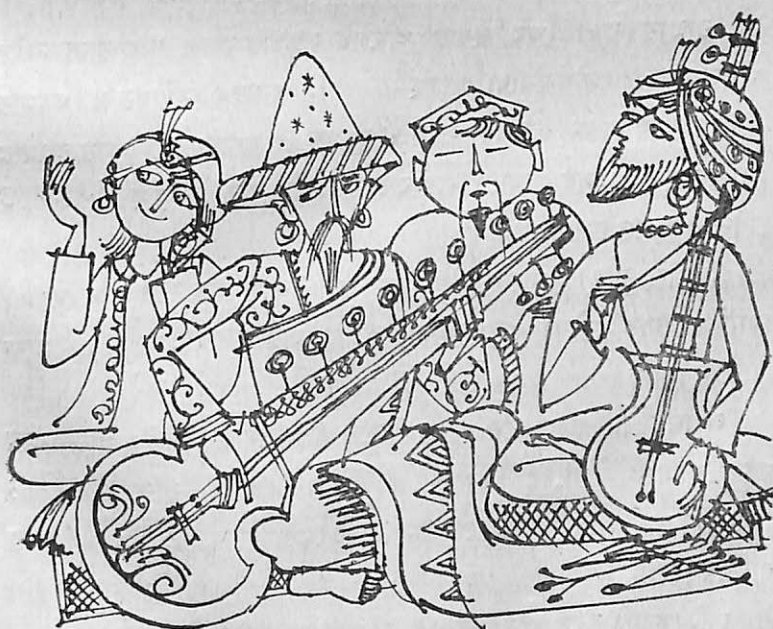
শহরে গিয়ে সে শুনল যে রাজসভায় আজ বড় বড় গায়কদের আর ভাল ভাল বাজনদারদের ডেকে আনানো হয়েছে। আর তাই শুনতে রাজসভায় লোকজন ছুটছে। সদাগরও গান-বাজনা শোনার জন্য রাজসভায় গেল। রাজসভায় গিয়ে সে দেখে হাজার হাজার লোক সেখানে বসে আছে। তাদের মাঝখানে রাজা বসে আছেন। রাজার সামনে বড় বড় গায়কেরা, বাজনা বাজিয়েরা, সবাইকে গান শোনাচ্ছেন, বাজনা শোনাচ্ছেন। এত সুন্দর গান সদাগর কখনও শোনেনি। সদাগর গান শুনতে বসে গেল। কিন্তু একটু পরেই সদাগর সভা ছেড়ে নিজের নৌকায় এল, সব ঠিক-ঠিক আছে দেখে ফিরে আবার রাজসভায় গিয়ে গান শুনতে লাগল। তারপর আধঘণ্টা পরে পরেই রাজসভা ছেড়ে সদাগর উঠে যায়, নিজের নৌকা দেখে ফিরে আসে, গান শোনে।

সদাগরকে বারবার যেতে আসতে দেখে শেষে দ্বিতীয় রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বলতো, তুমি বার বার উঠে বাইরে যাচ্ছ আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বসছ…?"

রাজার কথা শেষ হবার আগেই সদাগর বলল, "মহারাজ, নদীর পাড়ে আমার নৌকা বাঁধা রয়েছে। আমি একজন সদাগর। আমার ঐ নৌকায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তাছাড়া নৌকায় আমার বৌ আছে। এসব দেখাশোনার জন্য আমাকে অল্প কিছুক্ষণ পর-পরই নৌকার কাছে যেতে হচ্ছে।"

দ্বিতীয় রাজা বললেন, "আচ্ছা, তুমি শান্ত হয়ে বসে গান শোন। আমি তোমার নৌকা দেখাশোনা করার জন্য আমার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সদাগর নিশ্চিন্ত হয়ে গান শুনতে লাগলেন। দ্বিতীয় রাজা তাঁর দুই ছেলেকে, যাদের একজনকে তিনি জঙ্গলে হরিণের পিঠে পেয়েছিলেন, আর একজনকে নদীর জলের ধারে, তাদের নৌকায় পাঠিয়ে দিলেন।

দুটি ছেলেই বসে বসে নৌকার দেখাশোনা করতে লাগল। এমন

সময় একটি ছেলে অন্য ছেলেটিকে বলল, "এভাবে বসে বসে সময় কাটানো খুবই বিরক্তিকর। এস না আমরা নিজের নিজের জীবনের গল্প শোনাই। তাহলে সময় তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।"

দ্বিতীয় ছেলেটি ছোট, সে বলল, "ভাই আমার জীবনের গল্প বড় দুঃখের। তাই কি বলব, বরং তুমিই কিছু বল।"......কিন্তু বড় ছেলেটি বার বার বলাতে সে খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগল, "আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে আমার বাবা ছিলেন মস্ত বড় এক রাজা। কিন্তু ধ্বস নেমে তাঁর রাজ্য শেষ হয়ে গেল। আমার একজন বড় ভাইও ছিল। রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার আগেই আমার বাবা-মা আমাদের দুজনকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন। কিন্তু এরপরও অনেক বড় বড় বিপদ এল। আমার বাবার আনা সাতটি মণি গলে জল হয়ে গেল। আমাদের কাছে আর কিছু না থাকায় আমার মা তাঁর গলার হার বিক্রি করার জন্য বাজারে গেলেন, কিন্তু আর ফিরে এলেন না। তখন নিরুপায় হয়ে বাবা আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। পথে একটা নদী পড়ল, বাবা নদীর পাড়ে আমার বড় ভাইকে বসিয়ে, আমাকে পিঠে নিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন। বাবা আমাকে নিয়ে যেই নদীর মাঝামাঝি এসেছেন, এমন সময় জঙ্গল থেকে একটা হরিণ এসে আমার বড় ভাইকে নিজের পিঠে বসিয়ে পালিয়ে গেল। আমি যখন আমার দাদার এই অবস্থা দেখলাম তখন চিৎকার করতে শুরু করলাম। আমার চিৎকারে বাবা ঘুরে যেই ওদিকে দেখতে গেছেন তখনই আমি বাবার পিঠ থেকে জলে পড়ে গেলাম। ভাগ্য ভাল তাই ডুবে মরলাম না। ভেসে ভেসে নদীর পাড়ে এসে পড়ে রইলাম। আমাকে নদীর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখে এদেশের রাজা উঠিয়ে আনলেন এবং নিজের ছেলের মত মানুষ করছেন।"

ছোট ছেলেটির গল্প শেষ হতেই বড় ছেলেটি নিজের গল্প শোনাতে লাগল। দুজনের গল্পই একদম একরকম। যখন বড় ছেলেটি বলল যে তার বাবা তাকে নদীর ধারে বসিয়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে সাঁতরে

পার হচ্ছিল সেই সময় একটা হরিণ এসে তাকে পিঠে বসিয়ে জঙ্গলে পালাতে লাগল, তখন ছোট ছেলেটি বলল, "আরে, তুমি ত আমার ভাই, বড় দাদা।"

তুজনে তুজনের গল্প শুনে একজন আর একজনকে চিনতে পারল। এদিকে নৌকার ছোট্ট ঘরে বসে রানীও এ ছেলে তুটির গল্প চুপচাপ শুনছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এ তুটি ছেলে তাঁরই।

সকাল হতেই সদাগর রাজসভা থেকে ফিরে এল। রানী চিৎকার করে এঘর থেকেই সদাগরকে বলল, "রাতে এই নৌকা দেখাশোনার জন্য যে তুটি ছেলে এসেছিল তারা নৌকার সব ধনরত্ন চুরি করার চেষ্টা করছিল। আমি চিৎকার করে ত আপনার ধনসম্পত্তি রক্ষা করেছি কিন্তু ওরা যাবার সময় আমার গলার হার কেড়ে নিয়ে গেছে।"

রানীর কথা শুনে সদাগর পাগলের মত তখনই ছুটে রাজার কাছে এসে বলল, "মহারাজ, মহারাজ, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাল রাতে যে তুটি ছেলে নৌকায় পাহারায় ছিল তারা আমার বৌয়ের গলার হার চুরি করে নিয়ে গেছে।"

রাজা রেগে তুই ছেলেকে তখনই ডেকে পাঠালেন এবং সব কথা বললেন। কিন্তু ছেলে তুটি খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "বাবা, এই সদাগর মিথ্যা কথা বলছে। আমরা ত জানতামই না যে ঐ নৌকায় সদাগরের বৌও আছে।"

রাজা সদাগরকে বললেন, "তুমি তোমার বৌকে রাজদরবারে নিয়ে এস। আমি তার কাছ থেকে সব কথা শুনতে চাই। যদি চুরির কথা সত্যি হয় আমি তুটি ছেলেকেই কঠিন শাস্তি দেব। তাছাড়া তোমার হারের যা দাম তাও দিয়ে দেব।"

রাজসভা বসেছে। রাজা রেগে চোখ লাল করে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পাশে প্রথম রাজা, যিনি দ্বিতীয় রাজার কাজকর্ম করতেন তিনিও বসে আছেন।

সবার সামনে তুটি ছেলে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। এমন

সময় সদাগরের সঙ্গে রানী রাজদরবারে এলেন। দ্বিতীয় রাজা তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন, "এই ছেলে দুটি গতকাল রাতে তোমার গলা থেকে হার কেড়ে নিয়েছে ? সত্যি কথা বল ?"

রানী বললেন, "মহারাজ, এদুটি ছেলে, যাদের কাল রাতে নৌকা দেখাশোনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, এদের বলুন এরা নিজেদের জীবনের গল্প আগে বলুক তারপর আমি যা বলার তা নিশ্চয়ই বলব।"

রাজা ছেলে দুটিকেই নিজের জীবনের কথা শোনাতে বললেন। ছেলে দুটি পর-পর নিজেদের জীবনের গল্প শুনিয়ে গেল। প্রথম রাজা বসে বসে সব শুনছিলেন, তিনি ভাল করেই বুঝলেন এ ছেলে দুটি তাঁর।

ছেলে দুটি তাদের জীবনের কথা বলার পর দ্বিতীয় রাজা রানীর দিকে চেয়ে বললেন, "এবার তোমার যা বলার তা বল।"

তখন রানী বললেন, "মহারাজ, এ দু'টি ছেলে আমার। আমি আমার দুই ছেলে এবং স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি নিজের গলার হার বিক্রি করব বলে স্বামী ও ছেলে দুটিকে গাছের নিচে বসিয়ে বাজারে রওনা হয়েছিলাম। পথে নদী পড়ল। নদীতে নৌকায় এই সদাগরকে দেখে এর কাছেই হারটি বিক্রি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই সদাগর আমার হার দেখবে বলে আমাকে নৌকায় ডেকে নিয়ে আসে। তারপর এত দামী হারের লোভে আমাকে একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করে রাখে। আর সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা নিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। কাল রাতে ছেলে দুটি যখন নিজেদের জীবনের গল্প শোনাচ্ছিল তখনই বুঝতে পারলাম যে ঐ ছেলে দুটি-ই আমার। যদি আমি আমার গলার হার চুরির কথা না বলতাম তাহলে সে কখনই আমাকে আপনার সামনে নিয়ে আসত না। আমিও আমার নিজের সব কথা মহারাজের কাছে বলতে পারতাম না। আর এই দুষ্টু সদাগর আবার আমাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত।"

রানীর কথা শেষ হতেই, দ্বিতীয় রাজার পাশে বসেছিলেন প্রথম রাজা, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহারাজ, ইনি আমার রানী আর এদুটি ছেলে আমারই।"......একথা বলেই প্রথম রাজা ছেলে দুটিকে

বুকে টেনে নিলেন। রানীও প্রথম-রাজাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। আজ কত বছর পরে রানী তাঁর হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে আর স্বামী ফিরে পেয়ে খুব খুশি। তাঁর পুরোন সুন্দর দিন আবার ঘুরে এসেছে।

দ্বিতীয় রাজা সব ব্যাপার দেখেশুনে অবাক। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন সদাগরকে জেলখানায় বন্দী করে রাখতে। তিনি বললেন, "এই দুষ্টু সদাগরের বিচার পরে হবে।"

তাছাড়া রাজার আদেশে সদাগরের নৌকার সব ধন-সম্পত্তি রাজ-ভাণ্ডারে নিয়ে আসা হল।

কিছুদিন পর দ্বিতীয় রাজা প্রথম রাজাকে ডেকে বললেন, "দেখ, আমি বুড়ো হয়েছি। তুমিও তোমার রানী আর দুই ছেলেকে ফিরে পেয়েছ। আমার ইচ্ছা এবার তুমি এখানকার রাজা হয়ে খুব সুখে রাজত্ব কর, ভাল করে দেশের লোকজনদের দেখাশোনা কর। আমি এখন কেবল ভগবানের নাম গান করে দিন কাটাতে চাই।"……

অল্প কিছুদিন পরই বুড়ো দ্বিতীয় রাজা তীর্থযাত্রা করলেন আর প্রথম রাজা নিজের রানী আর ছেলেদের নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

মেঘকুমার

আগুনের মত গায়ের রং, চলতে ফিরতে সে রং আরও জ্বলে জ্বলে ওঠে, এমন সুন্দর রাজকন্যার নাম অগ্নিশিখা। রাজকন্যা অগ্নিশিখার ভীষণ পণ, যে সত্যিকারের বীর, তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। কত রাজপুত্র আসে, সবাই ফিরে যায়, রাজকন্যাকে কেউ খুশি করতে পারে না। রাজা সমরজিতের আরও কঠিন প্রতিজ্ঞা—তাঁর রাজদণ্ডটি যে ফিরিয়ে আনতে পারবে, তাকে তিনি দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। রাজার রাজদণ্ডটি চুরি হয়ে গেছে। এই রাজদণ্ডটি রাজা সমরজিতের বন্ধু কিন্নর রাজার উপহার। নানা মণিমাণিক্য দিয়ে গড়া রাজদণ্ডটির মাথায় লাগান আছে একটি আশ্চর্য ছোট্ট আয়না। যেই রাজা রাজদণ্ডটি হাতে তুলে নেন, রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে, প্রজারা কে কেমন আছে, সব ছবির মত ফুটে ওঠে আয়নায়।

রাজা গিয়েছিলেন দেশভ্রমণে, রাজদণ্ডটি রাখা ছিল সিংহাসনের উপর। ফিরে এসে দেখেন রাজদণ্ডটি নেই। কেউ কিছু বলতে পারে

না। রাজা খুঁজে খুঁজে হয়রান। অল্পদিন হল খবর পেয়েছেন, তাঁর রাজদণ্ডটি চুরি করে নিয়ে গেছে যাত্নরাজা।

রাজার প্রতিজ্ঞা শুনে কত লোক যে আসে তার ঠিক নেই, কিন্তু যে যায় রাজদণ্ড খুঁজতে, যাত্নরাজ্য মায়াপুরীতে, সে আর ফেরে না।

এই রাজ্যে ছিল এক চাষী আর তার তিন ছেলে। বড় আর মেজ ছেলে দেখতে খুব সুন্দর। বড় ছেলের নাম রূপকুমার আর মেজ ছেলের নাম অরূপকুমার। চাষী বড় আর মেজ ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছে। তারা রোজ সকালে সেজেগুজে পাঠশালায় যায়, পুথি পড়ে, নানা বিদ্যা শেখে। চাষীর ছোটছেলের নাম মেঘকুমার, দেখতে বড় ভাইদের মত সুন্দর নয়, কিন্তু স্বভাবটি ভারি ভাল। মেঘকুমারও দাদাদের মত পাঠশালা যেতে চায়। চাষীর বৌ বলে—যাক না ও পাঠশালায়। চাষী বলে—না না, ওর যা বুদ্ধি, পাঠশালায় গিয়ে কাজ নেই। শিখতে যদি হয়, ও দাদাদের কাছে বসে বাড়িতেই শিখুক।

কি আর করে মেঘকুমার, রাত্রিতে বাড়িতে যখন দাদারা পড়ে, ও তাই শুনে শেখে। দাদারা ত্নজনেই ওকে কিন্তু একটুকুও ভালবাসে না।

ভোরবেলা রূপকুমার আর অরূপকুমার পাঠশালা যায়, মেঘকুমার তখন গরুর ঘর পরিষ্কার করে, গরুগুলোকে খেতে দেয়। ত্নপুরে পাঠশালা থেকে ছুটি নিয়ে ত্ন ভাই বাড়িতে আসে ভাত খেতে। মেঘকুমার তখন বাবার সঙ্গে জমিতে কাজ করে, কখনও ধান রোয়, কখনও ক্ষেতে জল দেয়, কখনও ধান কাটে, আবার কখনও তীর ধনুক নিয়ে ক্ষেত পাহারা দেয়। খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারে মেঘকুমার। উড়ন্ত পাখি পর্যন্ত মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে।

এদিকে রাজার আর রাজকন্যার ইচ্ছাটা জেনে গেছে সারা দেশের লোক। চাষী একদিন তার ত্নই বড় ছেলেকে ডেকে বলে—রাজা আর রাজকন্যা সারা রাজ্যে কি খবর জানিয়ে দিয়েছেন শুনেছ ত?

—হ্যাঁ বাবা, আমরা শুনেছি। ত্নই ভাই একসঙ্গে বলে।

—যে সত্যিকারের বীর, রাজকন্যা তাকে বিয়ে করবেন।

অরূপকুমার বলে।

—যে রাজার চুরি হয়ে যাওয়া রাজদণ্ড ফিরিয়ে আনতে পারবে, তাকেই রাজা তাঁর অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। রূপকুমার বলে।

—তোমাদের দু ভাইয়ের ত অনেক বিদ্যা শেখা হল। তোমরা চেষ্টা করে দেখ না রাজত্ব আর রাজকন্যা পাও কিনা। আমি তোমাদের দু-ভাইকে দুটো ভাল ঘোড়া কিনে দিচ্ছি। তোমরা তাতে করে রাজ-পুরীর দিকে রওনা হয়ে যাও।

রূপকুমার আর অরূপকুমার নতুন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যায়।

দাদাদের যেতে দেখে মেঘকুমার বলে—বাবা, আমিও রাজপুরীতে যাব।

—তোর দাদারা দেখতে সুন্দর, কত বিদ্যে জানে, পুঁথি পড়তে পারে, যুদ্ধ করতে জানে আর তুই কি জানিস? কিছু না। তোর না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, দেখতেও তুই ভূতের মত। যা, যা, গরুর ঘাস কাটগে। গরুগুলোকে খেতে দিতে হবে না!

মেঘকুমার মনের দুঃখ চেপে গোয়ালঘরে চলে যায়। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে, সবাই যাই বলুক, সে রাজবাড়ি যাবেই।

—বাবা না দিক ঘোড়া, আমি হেঁটে হেঁটে রাজবাড়ি যাব, না হয় দুদিন পরই পৌঁছাব রাজবাড়ি।

তাই সে করল কি, গভীর রাতে ওর বাবা-মা যখন খুব ঘুমাচ্ছে তখন ও হাঁটা দিল রাজবাড়ির দিকে। সকাল হল, দুপুর হল, মেঘকুমার হাঁটছে ত হাঁটছেই। রাত হলে একটা গাছে উঠে মোটা ডালের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে নেয় গামছা দিয়ে। আর যেই সকাল হয় মেঘকুমার আবার হাঁটতে শুরু করে। এমনি করে দুদিন পরে ও পৌঁছাল রাজবাড়ির কাছে। সিংহদরজায় টাঙানো ছিল মস্ত বড় ঘণ্টা। মেঘকুমার সেটা দেখেই বাজিয়ে দিল ঢং—ঢং—ঢং। ছুটে এল রাজপ্রহরী।

—কে তুমি? কি চাই?

—আমি রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।

—রাজামশাই এখন রাজসভায়, চল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই।

প্রহরী মেঘকুমারকে রাজসভায় নিয়ে এল।

—মহারাজ, এই লোকটি সিংহদরজার ঘণ্টা বাজাচ্ছিল, কেন বাজাচ্ছে জিজ্ঞাসা করাতে বলল—আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—কি চাই তোমার? রাজা সমরজিৎ মেঘকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—মহারাজ, আমি আপনার হারানো রাজদণ্ড খুঁজে আনতে যাব।

রাজা মেঘকুমারের রোদে ঝলসানো, ধুলোমাটি মাখা কালো চেহারা
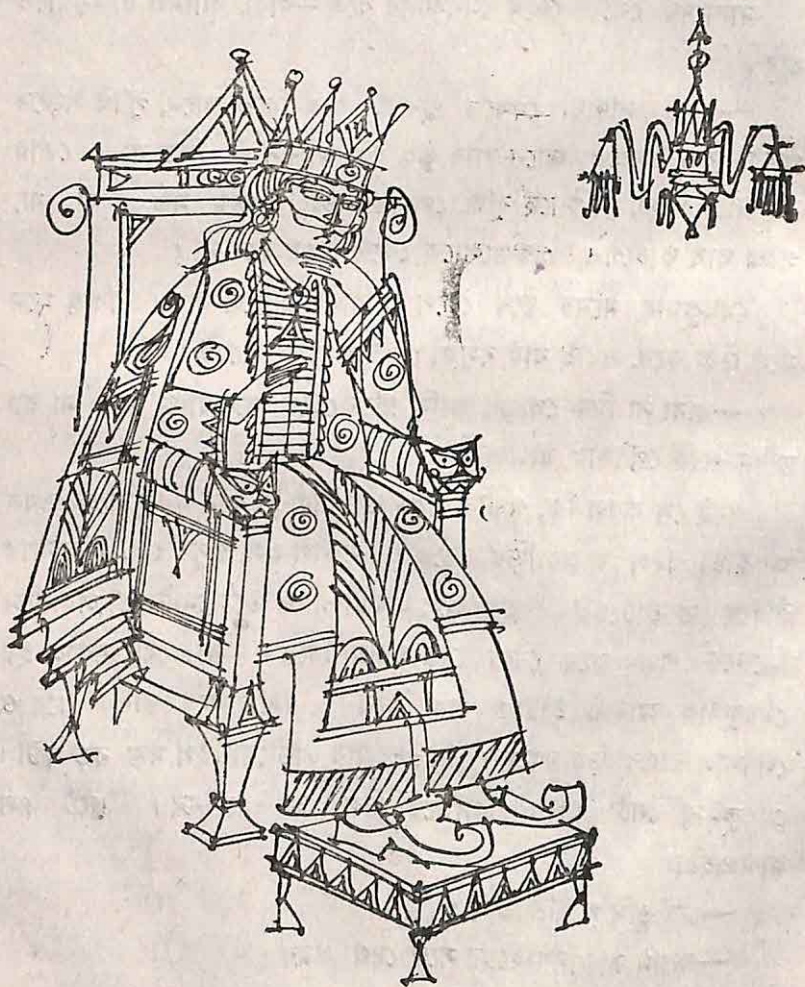
দেখে হতাশ হয়ে বললেন—কত রাজপুত্র, কত বীর যাদুরাজার দেশ মায়াপুরীতে গেল রাজদণ্ড ফিরিয়ে আনতে কিন্তু কেউ কিছু করতে পারল না। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। তোমাকে দেখে ত মনে হচ্ছে তুমি কিছুই জান না, তুমি যেতে চাও কোন সাহসে?

—মহারাজ, আমি ধান রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত ক্ষেতের সব কাজ জানি, এক নাগাড়ে দিন-রাত খাটতে পারি, খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারি, আকাশের উড়ন্ত পাখিকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি আর ভয় কাকে বলে আমি জানি না।

মেঘকুমারের কথা শুনে সভার লোকজন হো-হো করে হেসে উঠল। রাজাও খুশি হলেন না ওর কথা শুনে। বললেন—

—তোমার ত একটা ঘোড়াও নেই, যাবে কেমন করে?

—মহারাজ, আমি শুধু এই কথাটি বলতে এসেছি, আপনি আমাকে একটি ঘোড়া দিন, আমি মায়াপুরী যাব। আমি নিশ্চয়ই

আপনার রাজদণ্ড ফিরিয়ে আনতে পারব।

রাজার দয়া হল, যদিও জানেন সবার মত এ ছেলেটিও মায়াপুরী থেকে কখনই ফিরে আসবে না, তবু সেনাপতিকে ডেকে বললেন—

—সেনাপতি, এ ছেলেটিকে ঘোড়া দাও, ওর যখন মায়াপুরীতে যাদুরাজার কাছে যাবার এত ইচ্ছা, যাক।

সেনাপতিও মেঘকুমারকে দেখে একদম খুশি হয়নি। যা চেহারা, তার উপর না আছে ভাল পোশাক, যুদ্ধ করতেও জানে কিনা সন্দেহ, বলে কিনা মায়াপুরী যাবে। সেনাপতি ঘোড়াশালের সবচেয়ে বিচ্ছিরি রোগা ঘোড়াটাকে মেঘকুমারের কাছে এনে বলল—এই নাও ঘোড়া, এবার মায়াপুরী চলে যাও। বলেই সেনাপতি সেখান থেকে চলে যান।

হোক না রোগা বিচ্ছিরি, তবু ত নিজের বলে একটা ঘোড়া পেয়েছে। মেঘকুমার খুব খুশি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ও ঘোড়াটার সারা গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ঘোড়াটাও বেজায় খুশি। কেউ তাকে এত আদর কখনও করেনি। খেতে দিত না, যত্ন করত না ; কি কষ্টেই যে তার দিন কেটেছে, সে মেঘকুমারকে বলল—আমি জানি তুমি কোথায় যেতে চাও। তুমি আমার পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেব।

মেঘকুমার বলে—আমি কোথায় যাব বলত ?

—কেন ? তুমি যাবে মায়াপুরী, তাই না ?

—হ্যাঁ, কিন্তু কি করে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে আমি জানি না।

—আমি পথ চিনি, আমি খুব সকালেই সেখানে পৌঁছে দেব তোমাকে।

মেঘকুমার ঘোড়ার উপর উঠে বসে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটতে থাকে টগ্‌বগ্—টগ্‌বগ্। চারদিক অন্ধকার, তার উপর ঘোড়া এত জোরে ছুটছে যে মেঘকুমার কিছুই দেখতে পায় না। যেই সকালের আলো একটু ফুটি-ফুটি হয়েছে, মেঘকুমার দেখে তার ঘোড়া তাকে নিয়ে

একটা গুহার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। একটু পরেই গুহাটা শেষ হয়ে গেল। সকাল হয়েছে, চারদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘোড়া মেঘকুমারকে নিয়ে অন্য একটা গুহায় ঢোকে। এ গুহাটা আরও বড় আর কি অন্ধকার, চারদিক থেকে হুমহুম গুমগুম শব্দ, এক এক সময় মনে হচ্ছে কারা যেন হাঃ হাঃ করে হাসছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে কেউ ভীষণ জোরে জোরে কাঁদছে। ঘোড়া কিন্তু একটি বারের জন্যও কোথাও দাঁড়ায় না। গুহাটা শেষ হতেই ওরা খোলা জায়গায় এসে পড়ে। একটু এগোতেই আরও একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়ায়। এ গুহাটা কত যে বড় তার ঠিক নেই। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। শুধু গুহার ভিতর থেকে ভীষণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে, যেন দশটা বাঘ একসঙ্গে ডাকছে। মেঘকুমার ঘোড়াকে বলে, চল এগোই, দেখাই যাক কি আছে ভিতরে। যেই এগোতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভীষণ রাগী রাগী গলায় চিৎকার করে বলে ওঠে—দাঁড়াও বলছি, বলতে বলতে একটা প্রকাণ্ড চেহারার লোক এসে বাইরে দাঁড়ায়, ঝলমলে পোশাক তার গায়ে, মাথায় মুকুট, হাতে তরোয়াল।

মেঘকুমার দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কে তুমি? কি চাই তোমার এখানে?

—আমার নাম মেঘকুমার। আমি মায়াপুরী যাব।

—কেন?

—আমাদের রাজার রাজদণ্ড চুরি গেছে। চুরি করে নিয়ে গেছে যাদুরাজা। আমি সেটা ফিরিয়ে আনব যেমন করেই হোক।

—আমিই সেই যাদুরাজা।

—তবে ত ভালই হল, তুমি আমাদের রাজার রাজদণ্ড এখনই ফিরিয়ে দাও।

—যদি না দিই?

—তাহলে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ হবে, আমার ত অন্য কোন অস্ত্র নেই, আমি তীর ধনুক দিয়েই তোমার সঙ্গে লড়াই করব। এস, তৈরি হও। বলেই মেঘকুমার তীর ধনুক হাতে তুলে নেয়।

—শোন, শোন, যুদ্ধ করে তুমি রাজদণ্ড কিছুতেই আমার কাছ থেকে পাবে না, কোনমতেই না। তবে একটা শর্ত আছে।

—সেটা কি ?

—এ গুহার ভিতর ছোট বড় নানা রকম পাথর দিয়ে ভরা, সে-সব পাথর গুহার বাইরে এনে ফেলে পথ তৈরি করে তোমাকে গুহার অন্যদিক দিয়ে বের হতে হবে। কিন্তু মনে রেখ, একবার যদি গুহা থেকে বাইরে আস, দ্বিতীয়বার গুহাতে ঢুকতে গেলেই আমার তরোয়াল তোমাকে দুখণ্ড করে দেবে। এর আগে কত লোক এসেছে, কেউ দ্বিতীয়বার ঢোকার চেষ্টা না করেই পালিয়ে গেছে, কেউ আমার

তরোয়ালে প্রাণ দিয়েছে। এখন ভেবে দেখ কি করবে, গুহার ভিতর ঢুকবে, না ফিরে যাবে ?

একটু ভেবে মেঘকুমার বলে—যদি তোমার কথা রাখতে পারি তাহলে ?

—তোমার হাতে তোমার রাজার রাজদণ্ড ফিরিয়ে দেব।

—বেশ, আমি তোমার কথায় রাজি হলাম। বন্ধু ঘোড়া, তুমি গুহার মুখ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ডাকলেই তুমি গুহার ভিতর চলে আসবে। বলে মেঘকুমার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর ছোট বড় পাথরগুলো তুলে গুহার মুখ থেকেই গুহার বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। বেশি বড় পাথরগুলো টুকরো করে নেয় তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এইভাবে সমস্তদিন একভাবে পরিশ্রম করে যায়। সন্ধ্যে হতে হতেই গুহা একদম খালি। গুহার বাইরে পাথরের পাহাড়। এবার মেঘকুমার ডাক দেয়—বন্ধু ঘোড়া এস, চলে এস এবার।

ঘোড়াটা গুহার ভিতর ঢুকে পড়ে, মেঘকুমারকে পিঠে তুলে নিয়ে গুহার অন্য মুখ দিয়ে ছুটে বের হয়ে আসে।

—সাবাস মেঘকুমার, তোমার বুদ্ধি তোমার পরিশ্রম করা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।

—তাহলে তোমার কথামত এবার আমার রাজার রাজদণ্ড ফিরিয়ে দাও।

—আমি নিশ্চয়ই কথা রাখব। বলে যাদুরাজা গুহার সামনেই যে বিরাট রাজপুরীটা দেখা যাচ্ছিল সেখানে চলে যায়। তার একটু পরেই ফিরে আসে রাজদণ্ডটি হাতে করে।

—এই নাও তোমার রাজার রাজদণ্ড।

কি অপূর্ব দেখতে রাজদণ্ডটি, সোনার তৈরি আর কত মণিমাণিক্য মুক্তোর কাজ, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, রাজদণ্ডের মাথায় লাগানো ছোট্ট আয়নাটা। সেই আয়নাটার দিকে তাকিয়ে মেঘকুমার দেখতে পেল পুরো মায়ারাজ্য।

—বাঃ, যাদুরাজা তোমার মায়ারাজ্যটা ত খুব সুন্দর।

—চল, আমার মায়ারাজ্যটা ঘুরে দেখবে চল। যদি চাও ত এখানে তুমি থেকে যেতেও পার, খুব আরামে থাকবে এখানে।

—না যাদুরাজা, আমি আমার রাজাকে কথা দিয়েছি তাঁর রাজদণ্ড ফিরিয়ে নিয়ে যাব, তাই আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। আবার অন্য এক সময় আমি আসব। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এই রাজদণ্ডটা ছাড়া রাজার কাজ করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

যাদুরাজা তখন বলল—দেখ মেঘকুমার, এ রাজদণ্ডটা আমার একদম দেবার ইচ্ছা ছিল না। আমি অনেক কষ্টে রাজবাড়ি থেকে চুরি করে এনেছিলাম। আজ পর্যন্ত কেউ এটা নিয়ে যেতে পারেনি। আজ আমি তোমাকে এটা দিয়ে দিলাম কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই আমি আবার যাব রাজদণ্ডটা চুরি করে আনতে, ওটা আমার চাই-ই। সেদিন যদি তুমি এ রাজদণ্ডটি রক্ষা করতে পার, তবেই হবে তোমার আসল পরীক্ষা। সেদিন দেখব তোমার সাহস কত, তুমি কত বড় বীর।

—ঠিক আছে, আমি তৈরি থাকব। বলেই মেঘকুমার ঘোড়ার উপর উঠে বসে। ঘোড়াটাও ছুটতে থাকে। পরদিন পৌঁছে যায় রাজবাড়িতে।

সিংহদরজার কাছে এসেই মেঘকুমার বড় ঘণ্টাটা বাজিয়ে দেয়।

—এত সাতসকালে কে ঘণ্টা বাজায়? কে তুমি? খুব বিরক্ত হয়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করে।

—আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে গিয়ে বল তাঁর হারিয়ে যাওয়া রাজদণ্ড আমি ফিরিয়ে এনেছি।

প্রহরী ছুটে গেল রাজার কাছে। খবর পেয়ে রাজা ঘুম চোখে বিছানা থেকে নেমেই ছুটে এলেন।

—দেখি দেখি কোথায় আমার রাজদণ্ড!

—এই নিন মহারাজ। মেঘকুমার রাজদণ্ডটি রাজার হাতে তুলে দেয়।

—বাঃ, বাঃ তুমি ত সত্যি বীর মেঘকুমার। প্রহরী, তুমি একে আমার অতিথিশালায় নিয়ে যাও।

মেঘকুমার প্রহরীর সঙ্গে চলে যায়।

দুপুরে রাজসভায় ডাক পড়ে মেঘকুমারের। মেঘকুমার আসতেই রাজা বললেন—এস, এস মেঘকুমার, আজ পর্যন্ত যা কেউ পারেনি, সেই কাজ তুমিই করেছ। আমার বন্ধু কিন্নর রাজার দেওয়া উপহার এই রাজদণ্ডটি মায়াপুরী থেকে তুমিই ফিরিয়ে এনেছ। এটি চুরি হওয়াতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আজ থেকে আমার রাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব তোমার।

মেঘকুমার রাজাকে নমস্কার করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজকন্যা অগ্নিশিখা রাজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল—

—বাবা, এই লোকটি তোমার চুরি হয়ে যাওয়া রাজদণ্ড ফিরিয়ে এনেছে? একে দেখে কিন্তু আমার এতটুকুও বীর বলে মনে হচ্ছে না। যা চেহারা!

রাজা সমরজিৎ বললেন—ছিঃ রাজকন্যা, এত অহঙ্কার ভাল নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে, রাজকন্যা ততক্ষণে ঠোঁট বাঁকা করে অন্দর মহলে চলে গেছেন।

মেঘকুমার বলল—মহারাজ, আমি আপনার অর্ধেক রাজত্ব চাই না। তবে আমাকে একটা কাজের ভার দিতে হবে।

রাজা বললেন—তোমার পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু কি কাজের ভার চাও তুমি?

—এক মাসের জন্য রাজপুরী পাহারা দেবার কাজ দিন।

—এত সাধারণ কাজ তুমি করতে চাইছ কেন?

—মহারাজ এর জবাবও আমি একমাস পরেই দেব।

—বেশ, আজ থেকেই তুমি আমার রাজপুরী পাহারার কাজ পেলে।

মেঘকুমার রাজার অনুমতি নিয়ে রাজসভা থেকে চলে আসে। তারপর থেকে রোজ রাজার অতিথিশালায় সারাদিন ঘুমায় আর সন্ধ্যে

হলেই ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত রাত একটুকুও ঘুমায় না। মেঘকুমারের যত্নে ঘোড়াটাও এখন বিচ্ছিরি নেই, খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে।

একদিন হয়েছে কি, রাজা সমরজিৎ রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে রাজসভায় ঢুকে বলল—মহারাজ, শীগ্‌গীর বাঁচান আমাদের। অচিন দেশের রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে আপনার রাজ্য জয় করতে আসছে। আমাদের গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছে। আমাদের বাঁচান মহারাজ।

একথা শুনেই রাজা সমরজিৎ সেনাপতিকে আদেশ দিলেন,—সেনাপতি, সব সৈন্য নিয়ে এখনই রওনা হও। আমিও যাব যুদ্ধে, দেখি কি করে অচিনদেশের রাজা আমার রাজ্য জয় করে।

রাজা সমরজিৎ তাঁর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। রাজপুরী নিস্তব্ধ। রানীর ঘরে রানী, রাজকন্যার ঘরে রাজকন্যা, দাসদাসীর মহলে দাসদাসীরা। রাজা যুদ্ধে যাবার আগে রাজদণ্ডটি রাজকন্যার কাছে রেখে গেছেন। রাজকন্যা সেটি তার বিছানার উপর রেখে দিয়েছেন।

সেদিন রাত্রিবেলা, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যে যার ঘরে ঘুমাচ্ছে। একজন কিন্তু জেগে আছে, সে তার ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীর চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ তার মনে হল অন্ধকারে একটা আলো যেন এগিয়ে আসছে। মেঘকুমারের মনে সন্দেহ হল—যাদুরাজা আসছে না ত? সাতদিনের মধ্যেই ত তার রাজদণ্ডটা চুরি করতে আসার কথা। মেঘকুমার সিংহদরজার পাশে ঘোড়া থেকে নেমে অন্ধকারে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মশাল হাতে যাদুরাজা সিংহদরজার কাছে আসতেই মেঘকুমার বলে ওঠে—যাদুরাজা, আমি তৈরি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

—আচ্ছা, দেখি কি করে তুমি আমাকে আটকাতে পার!

হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাসতে হাসতে যাদুরাজা একটা পাথর তুলে কি সব মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিল রাজবাড়ির দিকে। পাথরটা যেই না লাগল গিয়ে রাজবাড়িতে, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল রাজবাড়ি, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। মেঘকুমার অবাক হয়ে সেদিকে তাকাতেই যাদুরাজা ছুটে ঢুকে পড়ে রাজবাড়িতে।

এদিকে রাজবাড়ি ভেঙে ভেঙে পড়ছে, মাটি কাঁপছে, সব্বাই ভয় পেয়ে যায়। চারদিকে চেঁচামেচি, রানীমা বের হয়ে আসেন, রাজবাড়ির দাসদাসীরাও বের হয়ে আসে। কিন্তু রাজকন্যা অগ্নিশিখা তখনও নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন রানীমা—আমার মেয়ে রাজকন্যা অগ্নিশিখাকে তোমরা কেউ বাইরে নিয়ে এস, তা না হলে ও চাপা পড়ে মরে যাবে নিশ্চয়ই।

রাজবাড়ি তখনও ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ভিতরে যেতে কারুর সাহস হয় না। মেঘকুমার রানীমার কান্না দেখে থাকতে পারে না। যাদুরাজাকে খোঁজা ছেড়ে দিয়ে, ছুটে যায় রাজকন্যার কাছে। যাদুরাজাও ঢুকেছে রাজপুরীতে কিন্তু সে এমন পোশাক পরে আছে যে একটা ইট-পাথরও তার গায়ে লাগছে না। এ-ঘর, সে-ঘর সে খুঁজেই চলেছে—কিন্তু কোথাও সে কিন্নর রাজদণ্ডটি খুঁজে পাচ্ছে না।

মেঘকুমার রাজকন্যার ঘরে ঢুকে দেখে রাজকন্যা ততক্ষণে জেগে উঠেছে কিন্তু বাড়িটা এত কাঁপছে যে সে ভাল করে দাঁড়াতেই পারছে না। ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁপছে রাজকন্যা। মেঘকুমার আর একটুকুও দেরি করে না। রাজকন্যাকে কাঁধে তুলে নেয়। হঠাৎ বিছানার উপর রাজদণ্ডটি ওর চোখে পড়ে যায়, মেঘকুমার রাজদণ্ডটিও তুলে নিয়ে বাইরে বের হবার জন্য ছুটতে থাকে। বড় বড় পাথর ওর মাথায় পিঠে পড়তে থাকে, মাথা ফেটে রক্ত পড়ে, পিঠ, হাত, পা কেটে দগদগে ঘা হয়ে যায় কিন্তু মেঘকুমার কোথাও দাঁড়ায় না, রাজকন্যাকে নিয়ে একেবারে বাইরে চলে আসে। রানীমা খুশি হয়ে ছুটে আসেন, মেঘকুমারকে অনেক আশীর্বাদ করেন।

ঠিক সেই সময় রাজা সমরজিৎ, তাঁর সেনাপতি, সব সৈন্য ফিরে

এলেন। অচিন দেশের রাজা যুদ্ধে হেরে তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

এদিকে যাত্নরাজা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোথাও রাজদণ্ড না পেয়ে যেই বেরুতে যাবে, দেখে সামনেই মেঘকুমার। মেঘকুমারের সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে কিন্তু মেঘকুমারের সেদিকে খেয়াল নেই, যাত্নরাজাকে যে ধরতে হবে। ধরেও ফেলে। চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকে—

—মহারাজ শীগ্‌গীর আস্থন, আমি যাত্নরাজাকে ধরেছি। এ-ই মন্ত্র-পাথর ছুঁড়ে রাজবাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

আর যায় কোথায়, যে যেখানে ছিল সব্বাই এসে ঘিরে ফেলল। তারপর শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। রাজা সমরজিৎ বললেন—তুমিই যাত্নরাজা ?

—হ্যাঁ।

—কেন এখানে এসেছিলে ?

—এসেছিলাম আপনার কিন্নর রাজদণ্ডটি চুরি করে নিয়ে যেতে।

—একবার ত চুরিই করে নিয়ে গিয়েছিলে।

—কিন্তু মেঘকুমারের বুদ্ধি আর পরিশ্রমের কাছে হার মেনে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু ওটা আমার চাই-ই। তাই আমি আবার এসেছিলাম চুরি করতে।

—রাজদণ্ডটি কোথায় ?

—এই যে মহারাজ, আমি এটা যাত্নরাজাকে দিইনি। মেঘকুমার রাজদণ্ডটি রাজার হাতে তুলে দেয়।

রাজা সমরজিৎ বলেন—যাত্নরাজা, তুমি এবারও মেঘকুমারের কাছে হেরে গেছ।

—হ্যাঁ, হেরেই ত গেলাম! রাজদণ্ডটি চুরি করতে এসেছিলাম আর রাজকন্যাকেও। কিছুই পারলাম না।

—রাজকন্যাকে চুরি করতে এসেছিলে? তোমার সাহস ত কম নয়!

—কিন্তু হল কই, সব ভেস্তে গেল মেঘকুমারের সাহসে।

—তোমাকে শূলে দেওয়া হবে, তুমি আমার এত সুন্দর রাজবাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ।

—মহারাজ সমরজিৎ, আমি অন্যায় ত ঠিকই করেছি, তবু আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আর কখনও এদেশে আসব না, কিন্নর রাজদণ্ডের লোভেও না আর রাজকন্যার জন্যও না।

—নাঃ, আমি তোমাকে শূলে দেবই। প্রহরী ওকে দিয়ে আয়।

—মহারাজ, আমাকে আপনি অর্ধেক রাজত্ব পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, আমি তার বদলে যাত্বরাজার প্রাণভিক্ষা চাইছি। ওকে ছেড়ে দিন। মেঘকুমার হাত জোড় করে রাজাকে বলল।

—আচ্ছা, তোমার কথায় ওকে ছেড়ে দেব কিন্তু তার আগে যাত্বরাজাকে তার যাত্ব দিয়ে আমার রাজপুরীকে আগের মত সুন্দর করে দিতে হবে এখনই।

—আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। যাত্বরাজা বলে।

হ্রিং, ট্রিং ছট্
হ্রিং ট্রিং ছট্
সব ঠিক হয়ে যাক
ঝট্-পট্।

যেই না যাত্বরাজা এই কথা বলেছে, এক মুহূর্তে সুন্দর নতুন বাড়ি হয়ে গেল সব। তাছাড়া যেখানে যা জিনিস ছিল, সব ঠিক হয়ে গেল আগের মত। সবাই ত কাণ্ড দেখে অবাক।

—এবার আমাকে ছেড়ে দিন। যাত্বরাজা বলে।

রাজা বলেন—ছেড়ে নিশ্চয় দেব কিন্তু এই যে মেঘকুমার, যার জন্য আমি আমার রাজদণ্ড ত্ব-ত্ববার ফিরে পেয়েছি, যার জন্য রাজকন্যার প্রাণ বেঁচেছে, তার অবস্থাটা দেখেছ—মাথা ফেটে গেছে, সারা শরীর কেটে থেঁতলে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেছে আর এসবই ত তোমার জন্যই। এখনই ওকে ভাল করে দাও।

—আচ্ছা মহারাজ তাই হবে—

ইট চাই, বিট চাই, ঝাঁই-ঝোঁক
মেঘকুমার বিদ্যুৎ হোক।

দেখতে দেখতে মেঘকুমারের গায়ের সব ঘা মিলিয়ে যায় আর মেঘকুমার দেখতে হয় সত্যি সত্যিই বিদ্যুতের মত সুন্দর।

রাজা সমরজিৎ বললেন—প্রহরী, যাত্নরাজাকে ছেড়ে দাও। আর মেঘকুমার আমার কাছেই থাকবে।

রাজার হুকুমে যাত্নরাজকে ছেড়ে দেওয়া হল। যেই না ছেড়ে দেওয়া, যাত্নরাজা ছুটতে শুরু করল, একদম নিজের মায়াপুরীতে এসে থামল।

রাজা সমরজিৎ মেঘকুমারকে বললেন—তুমি আমার রাজ্যের সবচেয়ে বড় বীর, তাই তোমার হাতেই দিলাম আজ থেকে দেশ রক্ষার ভার। আর আমার পর তুমিই হবে এ দেশের রাজা।

আর রাজকন্যা অগ্নিশিখা, এবার বলত মেঘকুমার সত্যিকারের সাহসী আর বীর কিনা? রাজকন্যার দিকে ফিরে রাজা প্রশ্ন করলেন।

রাজকন্যা হাসির আগুন ছড়িয়ে দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন, তারপর নিজের গলার মুক্তার মালাটি খুলে মেঘকুমারের গলায় পরিয়ে দিলেন।

কাক-তাড়ানী রানী

এক রাজা, তাঁর সাত রানী। ছয় রানীর কোন ছেলেমেয়ে নেই। সব থেকে ছোট রানীর কিন্তু পর পর দুটি ছেলে হল। বড় ছয় রানী ভারি হিংসুটে। প্রত্যেকবার ছোট রানীর ছেলে হবার পরই সেই ছেলেকে বাইরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। আর ছোট রানীর কাছে ছেলের বদলে রেখে দেয় কুকুরছানা, বেড়ালছানা।

ছয়-রানীর ছিল এক খুব আদরের ঝি। রানী মহলে সে ছিল ঝিদের সর্দারনী। সেই সর্দারনী ঝি রাজাকে খবর দিয়ে আসে, ছোট-রানীমার একটা কুকুরছানা হয়েছে। কোনবার রাজাকে বলে আসে, ছোট রানীমার এবার একটা বিড়াল ছানা হয়েছে। রাজা খুব দুঃখ পান।

এবার ছোট রানীর আবার ছেলে হবে। রাজা এবার ঠিক করেছেন এবার যদি ছোটরানীর কুকুরছানা বা বিড়ালছানা হয় তবে দেবেন তাকে তাড়িয়ে।

ছয় রানী করেছে কি, তাদের সেই ঝি-সর্দারনীকে দিয়ে একটি ছাগলছানা আনিয়ে রেখেছে। ছোটরানীর এবার একটি মেয়ে হল। মেয়েটিকে ছয় রানী তাড়াতাড়ি ছোট রানীর কাছ থেকে সরিয়ে ঝি-সর্দারনীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আস্তাকুঁড়ে আর মেয়েটির জায়গায় রেখে দিল ছাগলছানাটা।

এদিকে রাজা খবর পেয়ে রাজদরবার ফেলে ছুটে এলেন।

রাজাকে দেখেই ছয় রানী ঠাট্টা করে ছাগলছানাটা দেখিয়ে বলে, "ও রাজা দেখ, দেখ তোমার আদরের ছোটরানীর কি সুন্দর ছেলে দেখ।"

রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি তখনই হুকুম দিলেন, ছোটরানীকে এখনই বার করে দাও রাজবাড়ী থেকে। রাজবাড়ীর বাইরে ও থাকবে। ওর কাজ হবে আজ থেকে রাজবাড়ীতে যাতে কাক চিল না আসতে পারে, সারাদিন ছোটরানী কাক, চিল তাড়াবে। আর রাজবাড়ীর এঁটোকাঁটা যা ফেলে দেওয়া হয় তাই ওকে খেতে দেওয়া হবে। ছোট রানী হবে রাজবাড়ীর কাক-তাড়ানী।

ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ঝি-সর্দারনী আস্তকুঁড়ে ফেলতে এসেছে। ওমা দেখে কি, আস্তাকুঁড়ে ছয়টি সুন্দর ছেলে খেলা করছে। সব চেয়ে যেটি বড় সে তো ছোট্ট মেয়েটিকে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিল।

ঐ আস্তাকুঁড়ের পাশেই রাজার গোয়াল ঘর। গরুগুলো যখন সকালে মাঠে চরতে যেত আবার বিকেলে মাঠ থেকে গোয়ালে ফিরত,
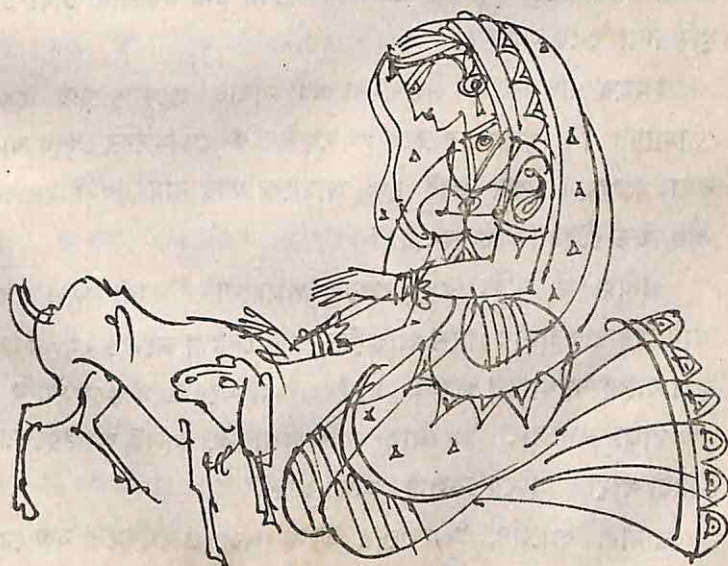
বাছুরগুলো নিজের নিজের মায়ের দুধ খেত। রাজার বাড়ীর গরু খুব মোটা-সোটা ভাল গরু, খুব দুধ তাদের। আর তাই বাছুরগুলো যখন দুধ খেত তাদের মুখের দুপাশ দিয়ে দুধের ধারা গড়িয়ে পড়ত। ছোট-রানীর ছেলেরা ঐ দুধ দুবেলা পেট পুরে খেত।

ঝি-সর্দারনী ত ছেলেদের কাণ্ড দেখে অবাক। আরে, যাদের মেরে ফেলার জন্য এই আস্তকুঁড়ে ফেলা তারা কি সুন্দর ভাবে বড় হয়ে উঠছে! সে ছুটে চলে গেল ছয় রানীর কাছে। ছয় রানী ত প্রথমে বিশ্বাসই করে না।

রাজবাড়ীর অন্য ঝিরাও গেল দেখতে। তারা ফিরে এসে একই কথা বলল। শুনেটুনে ত ছয় রানীর মনে আগুন জ্বলে উঠল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে একটা উপায় ঠিক করল। তারা রাজা রাজসভা থেকে ফিরে আসার আগে করল কি নিজেদের বিছানায় গিয়ে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল।

রাজা রাজবাড়ীর ভিতর এসে কোন সাড়া শব্দ পান না। তিনি তাঁর রানীদের এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করতে লাগলেন। এ-ঘর ও-ঘর পার হয়ে শোবার ঘরে এসে দেখেন তাঁর ছয় রানী চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

"আরে একি কাণ্ড! তোমরা এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছ কেন? তোমাদের কি অসুখ করেছে? কেউ কি তোমাদের কোন খারাপ কথা বলেছে। যদি তাই হয় আমাকে তার নাম এখনই বল আমি তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।"

রানীরা ত সত্যি কথা বলতে পারে না। তারা বলল, "রাজা, আমাদের রাজবাড়ীর পাশে আস্তকুঁড়ে এত নোংরা জমেছে যে কাজকর্ম করা যাচ্ছে না খারাপ গন্ধে। তাই আমরা ঘরে এসে শুয়ে আছি।"

রাজা বললেন, "এ আর বেশি কথা কি, কালই আস্তকুঁড়ের সব নোংরা শহরের বাইরে ফেলার ব্যবস্থা হবে।"

রানীরা বললেন, "আমাদের ইচ্ছে শহরের যেখানে যত নোংরা আছে সব নিয়ে শহরের বাইরে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে ফেলে গর্তটা

বন্ধ করে দিলে সমস্ত শহরটাও পরিস্কার হয়ে যাবে।"

রাজা বললেন, "খুব ভাল কথা, এর জন্য চিন্তার কিছু নেই। তোমরা যদি আমাকে আগে বলতে তবে আরও আগেই ব্যবস্থা করতাম।"

রাজা তখনই রাজবাড়ীর বাইরে এসে হাঁক দিলেন, "প্রহরী।"

প্রহরী এল।

রাজা বললেন, "দেখ কাল সকাল হলেই শহরের যত আস্তকুঁড় আছে তার সব নোংরা শহরের বাইরে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে পুঁতে ফেলবে। বিকেলের মধ্যে শহরের কোথাও যেন এক ফোঁটা নোংরা না থাকে।"

সকাল হতেই প্রহরী অনেক লোক নিয়ে এল, প্রথমেই রাজবাড়ির কাছে যে আস্তকুঁড় ছিল তা পরিস্কার হল। ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা কোথায় যায়, ওরা রাজার গোয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ওখানে রাজপুত্রদের আর রাজকন্যার দিন বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

একদিন হয়েছে কি, রানীদের টাটকা দোয়া দুধ খাবার শখ হল। তখনই বড় রানী ঝি-সর্দারনীকে পাঠাল গোয়ালে। ঝি-সর্দারনী গোয়ালে এসে দেখল ছয়টি সুন্দর ছেলে, একটি ফুটফুটে মেয়ে গোয়ালে খেলা করছে। ঝি-সর্দারনী সব বুঝে ছুটল রাজবাড়ি।

"ও রানীদিদিরা, তোমাদের শত্তুররা ত খুব ভাল ভাবে গোয়ালে আছে। দুবেলা গরুর দুধ খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে। একদিন ওদের হাতেই তোমাদের প্রাণ যাবে।"

"সে কি? সে কি?" ছয় রানী ছুটে এল।

"তা হলে উপায়?" ছয় রানী ঝি-সর্দারনীকে জিজ্ঞাসা করল।

"উপায় একটাই। রাজবাড়ির গোয়ালের সব গরুগুলো যদি মেরে ফেলা যায় আর গোয়াল ঘরটা যদি ভেঙ্গে ফেলা যায় তবে তোমাদের সব শত্রুরা খেতেও পাবে না, থাকতেও পারবে না—তখন মরবেই।"

রানীরা বলল, "ঠিক ঠিক।"

সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আর তাই সন্ধ্যে হতেই ছয় রানী চাদর টাদর মুড়ি দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল। রাজা রাজসভার কাজ শেষ করে ভিতর মহলে এলেন। এ-ঘর, ও-ঘর করতে করতে শেষে শোবার ঘরে এলেন, দেখেন তাঁর ছয় রানী চাদর-টাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে।

রাজা বললেন, "আরে আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান, আর তোমরা সবাই শুয়ে আছ। হল কি তোমাদের? এখনই শুয়ে পড়েছ কেন? তোমাদের কি অসুখ করেছে?"

"না রাজা, রাজবাড়ির পাশেই গোয়ালঘর, খারাপ গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। কি করে কাজকর্ম করব। তাই শুয়ে আছি।"

রাজা বললেন, "বেশ ত কাল সকালেই রাজবাড়ির কাছ থেকে গোয়ালঘর অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

"গোয়াল সরালে কি হবে, গরুগুলোর দুধ খারাপ। ঐ দুধ খেয়ে আমাদের কারুর শরীর ভাল থাকছে না। গরুগুলোকে মেরে ফেলাই ভাল। আর গোয়ালঘরটাও ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার।"

"এতগুলো গরু মেরে ফেলব? গোয়ালটা না হয় ভেঙ্গে দেওয়া যাবে। কিন্তু এতগুলো গরু—"

রাজার কথা শেষ হবার আগেই বড় রানী বলল, "তাহলে রাজা, আমরা কেউ খাব না কিন্তু।"

"ছয় রানীর জিদ্ দেখে রাজার কষ্ট হলেও কি আর করেন তখনই রাজবাড়ির বাইরে এসে হাঁক দিলেন, "প্রহরী।"

প্রহরী এল।

রাজা বললেন, "কাল রাজবাড়ির সব গরুগুলোকে দূরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে আর গোয়াল ঘরটাকে ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।"

পরদিন সকালে গরুগুলো সেই যে মাঠে এল আর ফিরে এল না। গোয়ালঘরটাও ভাঙ্গা শুরু হল। তখন ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা

কোথায় যায়, এদিকে খুব খিদেও পেয়েছে, ওরা রাজার ফলের বাগানে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

রাজার প্রকাণ্ড বড় ফলের বাগান। সারা বছর কত রকমের ফল হয় সেখানে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নানা রকম কলা, পেয়ারা, নাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, বেদনা, আতা আরও কত কি। ওরা ছয় ভাই এক বোন সারাদিন বাগানের ফল খায় আর রাত্রিবেলা প্রায় বুজে যাওয়া একটা শুকনো কুঁয়োর মধ্যে সুন্দর ঘাসের বিছানায় ঘুমায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘোরে।

হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ছয় রানীর ফল খাবার শখ হল। তারা ঝি সর্দারনীকে সঙ্গে নিয়ে রাজার ফলের বাগানে এল।

বাগানে এদিক ওদিক ছয় ভাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সবচেয়ে ছোট বোন রাজকন্যা সপ্তমী কুঁয়োর মধ্যে ঘাসের বিছানাটা পরিস্কার করছিল, আর মিষ্টি সুরে গান করছিল। একটু পরে ছয় ভাই কুঁয়োর কাছে এসে হাজির হল। ঠিক সেই সময় ছয় রানীও বাগানে এসেছে, সঙ্গে ঝি-সর্দারনী। সে বলে উঠল, "বাঃ, রানীদিদিরা দেখ দেখ তোমাদের শত্তুররা এখানে কেমন আরামে আছে। বাগানের ফল খাচ্ছে আর শুকনো কুঁয়োর ঘাসের বিছানায় আরামে ঘুমাচ্ছে।"

ছয় রানী এক সঙ্গে বলে উঠল, "তাই তো! দেখাচ্ছি মজা। আজ রাতেই ওরা যখন ঘুমাবে তখনই ঐ কুঁয়ো বন্ধ করে দিতে হবে মাটি ফেলে। ছয় ভাই আর এক বোনকে ভোরবেলা ঘুম থেকেই উঠতে হবে না। এখন চল আমরা রাজবাড়ি ফিরি।"

ছয় রানী ফল আর খাবে কি, রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে রাজবাড়িতে ফিরে এল। মনে মনে বলল, "আজ রাতেই সাত সত্তুরকে শেষ করতে হবে।"

রাজবাড়ি এসেই তারা সোজা শোবার ঘরে এসে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। রাজা রাজসভা থেকে এসে রানীদের এ-ঘর ও-ঘর খোঁজেন। কোথাও তাদের দেখতে না পেয়ে শেষে শোবার ঘরে দেখেন তাঁর ছয় রানী চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

"ও রানীদিদিরা আর দোলে আনন্দে সেজেগুজে কি করবে, ঐ মালী-সর্দারের বাড়ীতে তোমাদের শত্তুররা মহা আনন্দে আছে।"

"সে কি? ওরা মাটি চাপা পড়েও মরেনি!" ছয় রানীর মাথায় হাত। ছয় রানীর বড় বানী বলল, "আচ্ছা এবার দেখাচ্ছি মজা, এবার ওদের দেশ থেকেই তাড়াব।"

সেদিন সন্ধ্যে হতেই ছয় রানী আবার চাদর-টাদর চাপা দিয়ে শুয়ে রইল। রাজা রাজসভার কাজ শেষ করে ভিতরে এলেন। এ-ঘর, ও-ঘর খোঁজেন কোথাও পান না। শেষে শোবার ঘরে তাঁর ছয় রানীকে শুয়ে থাকতে দেখতে বলেন, "কি হল তোমাদের? এখন শুয়ে আছ কেন? অসুখ করেছে?"

ছয় রানীর মধ্যে যে সব চেয়ে বড় সে বলল, "রাজা তোমার রাজ্যে যখন এত অন্যায় তখন আমাদের মরে যাওয়াই ভাল। তাই আমরা অনেক দুঃখে শুয়ে আছি।"

"কে অন্যায় করেছে তোমাদের সঙ্গে? তার নাম বল আমি এখনই তাকে কঠিন শাস্তি দেব।"

"আমরা ছয়জন আজ গিয়েছিলাম রাজবাড়ির ফুল বাগানে। এত বড় বাগান কিন্তু একটাও ফুল নেই। কাল দোল। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা ছয়জন সুন্দর করে মালা গাঁথব, কাল আপনাকে সাজাব। কিন্তু ফুলই পেলাম না তা মালা গাথব কি। আমরা রানী, আমরা যা চাই তা যদি না পাই তাহলে দেশের রানী হয়ে কি লাভ!"

"ঠিক আছে, কালই সর্দার মালীকে ডেকে পাঠাচ্ছি, বাগানের সব মালিকে কঠিন শাস্তি দেব। রাজ-বাগানে ফুল নেই এটা খুব খারাপ কথা।"

"ওতে মালীদের কিচ্ছু হবে না, সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে ওদের এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বল। তবেই ঠিক শাস্তি হবে। কাল সকাল হবার আগেই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে সবাই।"

রাজা বললেন, "বেশ তাই হবে।"

রাজা বাইরে এলেন, হাঁক দিলেন, "প্রহরী।"

প্রহরী এল।

"যাও, এখনই সব রাজবাড়ির মালীদের গিয়ে বলে এস তারা সকাল হবার আগেই যেন রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। ভোরে উঠে যেন কারুর মুখ আমায় দেখতে না হয়।"

মালী সর্দারের বাড়িতেও এ খবর গেল। রাজার হুকুম রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। মালী আর মালীর বৌ চোখের জল মুছতে মুছতে নিজেদের জিনিস-পত্র গোছাতে লাগল।

ছয় রাজপুত্র এখন বড় হয়েছে, সপ্তমী বোনও এখন ছোটটি নয়। তারাও রাজার হুকুমটা শুনল। বড় রাজপুত্র অন্য ভাইদের আর বোনকে বলল, "দেখ, রাজা যে থেকে থেকেই অদ্ভুত সব হুকুম দিচ্ছেন তার কারণ কিন্তু আমরাই।"

অন্য পাঁচজন রাজপুত্র একসঙ্গে বলে উঠল, "কেন দাদা, কেন?"

"রাজা যেমন করেই হোক আমাদের মেরে ফেলতে চান। আর আমাদের জন্য অন্যরাও কষ্ট পাচ্ছে। চল, আমরাই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।"

রাজকন্যা সপ্তমী বলল, "চল দাদারা আমরা চলে যাই।"

মালী আর মালীর বৌ এদিকে জিনিস-পত্র বাঁধাছাঁদা করছে। ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা সপ্তমী চুপি চুপি অন্ধকারে বের হয়ে পড়ল।

যেতে, যেতে, যেতে, কত নদী, নালা পার হয়ে ওরা এক মস্ত জঙ্গলের কাছে এসে পৌঁছাল। ঐখানে ছয় ভাই মিলে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরী করল। তারপর ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা সপ্তমী ওখানে থাকতে লাগল।

ঐ জঙ্গলে ছিল একটা মন্দির আর মন্দিরে থাকত এক সন্ন্যাসী। মন্দিরে পুজোর জন্য সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে মানুষ ধরে আনত আর বলি দিত। সন্ন্যাসী ছয় রাজপুত্র আর সপ্তমীকে দেখেছে। রাজকন্যাকে ত সন্ন্যাসীর দরকার নেই কিন্তু ছয় রাজপুত্রকে কি করে ধরে আনবে সে-কথা চিন্তা করতে লাগল।

ছয় ভাই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। রাজকন্যা সপ্তমী বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি এসে রাজকন্যা সপ্তমী ছেলেদের মত করে সাজল, চুলগুলো মাথার উপর ঝুটি করে বেঁধে নিল। তারপর হাতে তরোয়াল, পিঠে ধনুক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আবার ঢুকল। যেতে যেতে ভাবল, "যদি দরকার হয় আজ সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করব, যদি মরতে হয় মরব কিন্তু দাদাদের ছাড়িয়ে আনবই।" কিন্তু হয়েছে কি জঙ্গলের ভিতর এমনিতেই অন্ধকার তার উপর সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘন অন্ধকারে রাজকন্যা সপ্তমী পথ হারিয়ে ফেলেছে। মন্দিরটা আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। হঠাৎ রাজকন্যা সপ্তমী অনেক দূরে একটা আলো দেখতে পেল। রাজকন্যা সপ্তমী আলোটা দেখে সোজা সেদিকে এগোতে লাগল। ভাবল, আজ রাতটা বাড়িটাতে থাকি কাল সকালে সন্ন্যাসীর মন্দিরটা খুঁজে বার করব। ঐ বাড়িটাতে থাকত সন্ন্যাসীর গুরু ডাইনী।

রাজকন্যা সপ্তমী বাড়িতে ঢুকে দেখে সামনের ঘরে বসে আছে এক বুড়ি।

বুড়ি মুখ তুলে বলল, "তুই কে রে? কি নাম তোর?"

"আমার নাম সপ্তমী। আমার ছয় ভাইকে এক দুষ্টু সন্ন্যাসী কাল রাতে ধরে নিয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাইদের ছাড়িয়ে আনতে। আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে আজ রাতটা তোমার কাছে থাকতে দেবে দিদিমা?"

"তুই কে তা তো বললি না?"

"আমি ছয় ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট বোন।" বলতে বলতে রাজকন্যা সপ্তমী বুড়ির খুব কাছে এসে বসল। বুড়িরও খুব ভাল লেগে গেছে রাজকন্যা সপ্তমীকে। বুড়ি বলল, "তুই পারবি ঐ মস্ত বড় লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে?"

"কেন পারব না দিদিমা, আমি দাদাদের কাছ থেকে তীর চালাতে শিখেছি, তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতে শিখেছি।"

"কিন্তু সন্ন্যাসীটা যে মন্ত্রতন্ত্র জানে।"

"এই না হবে সন্ন্যাসী আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু আমিও ওকে একদম শেষ করে দেব। আমার দাদাদের যেমন করে হোক ছাড়িয়ে আনতেই হবে।" বুড়ি একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুই পারবি। ঠিক আছে তুই যখন যাবি তখন আমি তোকে শিখিয়ে দেব কি করতে হবে। আচ্ছা, তুই রান্না করতে পারিস?"

"হ্যাঁ, দিদিমা। আচ্ছা, আজ আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব। শুধু তুমি কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও।"

বুড়ির কেউ ছিল না, নিজেকে সব কাজ করতে হত। কিন্তু সে-রাতে রাজকন্যা সপ্তমী বুড়িকে কিছু করতে দিল না। রান্না বান্না করল, বাড়ি-ঘর ঝাড়ল, বুড়ির চুল বেঁধে দিল। তারপর খুব যত্ন করে খাওয়াল, বুড়িকে শুতে বলে পা-হাত টিপে দিল। বুড়ি এত যত্ন জীবনে কখনও পায়নি। ভীষণ খুশি হল।

সকালে উঠে বুড়ি বলল, "দেখ নাতনী, এ-বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটবি। কয়েক পা এগোলেই দেখবি মন্দির, মন্দিরের উঠোনে সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে পুজো করছে, সামনে ছয়টা বাটি রাখা আছে। তুই সোজা গিয়ে নিজের হাতের তালুটা কেটে ছয়টা বাটিতে রক্ত ভরে দিবি। ঐ ছয় বাটি রক্ত পেলেই সন্ন্যাসী তোর ছয় ভাইকে ছেড়ে দেবে।"

"বেশ দিদিমা আমি তাই করব।" বলে রাজকন্যা সপ্তমী ধনুক পিঠে নিয়ে তলোয়ার হাতে করে এগিয়ে চলল। কয়েক পা এগোতেই মন্দির দেখতে পেল। মন্দিরের উঠোনে সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে পুজোয় বসে আছে। তার সামনে ছয়টা বাটিও রাখা। রাজকন্যা সপ্তমী তলোয়ার এক হাতে শক্ত করে ধরে অন্য হাতের তালুটা চিরে ফেলার জন্য তৈরী হল। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ওর হাত ধরে ফেলল। রাজকন্যা সপ্তমী ফিরে দেখে সেই ডাইনীবুড়ি যার বাড়িতে সে রাতে ছিল। বুড়ি বলল, "নাতনী, তোর সাহস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাছাড়া তোর মত লক্ষ্মী মেয়েও আমি কোনদিন দেখিনি। ও সন্ন্যাসী, ওঠ, ওর ছয় ভাইকে এখনই ছেড়ে দাও। আর

এখানে ডেকে আন।"

ছয় ভাই এল। বুড়ি বলল, "দেখ তোরা এদেশের রাজার ছেলে মেয়ে।" ছয় ভাই ও সপ্তমী বোন ত অবাক।

তারপর বুড়ি রাজা, তাঁর ছয় রানী, ঝি-সর্দারনী আর রাজসভার সব লোকদের নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ডেকে পাঠাল। কাক তাড়ানী রানীকেও নেমন্তন্ন করা হল। রাজকন্যা সপ্তমী ভাল ভাল নানা খাবার রান্না করল। খাওয়া দাওয়ার সময় বুড়ি রাজকন্যা সপ্তমীকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করতে বলল। আর অন্য একটা ঘরে ছয় রাজপুত্রকে ও কাকতাড়ানী রানীকে লুকিয়ে রাখল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ির সামনের বড় ঘরে সভা বসল। সবাই বসল। বুড়িও বসল। তার কাছে একটা কুকুর, একটা বেড়াল, একটা ছাগল এনে রাখা হল। বুড়ি বলল, "একটা কথা বলার জন্য আজ আপনাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছি। এই যে দেখছেন, এই কুকুর, বেড়াল আর ছাগল—এদের পেটে ছয়টি সুন্দর ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছে।" বলেই বুড়ি ডাক দিল, "আমার নাতি, নাতনীরা এদিকে আয়।" ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা সপ্তমী মাথার ঘোমটা খুলে সভার মাঝখানে এল। রাজার ছয় রানী আর ঝি-সর্দারনী ত দেখেই চিনেছে, ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে।

রাজা বললেন, "তাই কি কখনও হয়! এত সুন্দর ছয়টি ছেলে আর এত ফুটফুটে মেয়ে কখনও কুকুর, বেড়াল আর ছাগলের হয় নাকি? সব মিথ্যে কথা।"

বুড়ি তখন বলল, "তবে মানুষের ঘরে কুকুরছানা, বেড়ালছানা, ছাগলছানা হয়?"

রাজা বললেন, "তাইতো!"

বুড়ি বলল, "মহারাজ এরা আপনার ছোটরানী—কাকতাড়ানী রানীর ছেলে-মেয়ে। আপনি কেমন রাজা? কোন খোঁজ নিলেন না, আপনার হিংসুটে ছয় রানী যা বলল তাই বিশ্বাস করলেন। তাছাড়া

ছয় রানীর ইচ্ছায় গোয়ালের সব ভাল ভাল গরুদের মেরে ফেললেন, মালীদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়ালেন। একবার নিজে কিছু ভাবলেন না।" রাজা লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "এদের তুমি কি করে পেলে ?" বুড়ি বলল, "আপনার ছয় রানীর হুকুমে এই ছয় ছেলে আর মেয়েকে ঝি-সর্দারনী আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে, সেখান থেকে এরা সাতজন প্রথমে গোয়ালে, তারপর ফলের বাগানে, সবশেষে সর্দার মালীর বাড়ি, তারপর মালীদের নির্বাসন হলে এরা বনে এসে থাকতে লাগল আর বনেই এদের সঙ্গে আমার দেখা।"

রাজার এক এক করে আগের সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, হাঁক দিলেন, "প্রহরী।"

প্রহরী সামনে এল।

"যাও এখনই ছয় রানীকে আর ঝি-সর্দারনীকে আমার বন্দীশালায় কয়েদ করে রাখ, পরে এদের বিচার হবে।"

ঝি-সর্দারনী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার কি দোষ, রানীরা আমাকে হুকুম করেছেন তাই আমি ছোটরানীর ছয় ছেলে এক মেয়েকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে এসেছি।"

"আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। প্রহরী একেও নিয়ে যাও।"

প্রহরী ছয় রানী আর ঝি-সর্দারনীকে নিয়ে চলে গেল।

কাকতাড়ানী রানীকে ডাকা হল। সে বেচারা ত ছেঁড়া নোংরা শাড়ী পরে আছে। রাজা ডাকছেন শুনে ভয়েই অস্থির, না-জানি আরও কি শাস্তি তার ভাগ্যে আছে।

বুড়ি তখন রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমি আর এই সন্ন্যাসী শিষ্য ছয় রাজপুত্রকে বলির জন্য ধরেছিলাম। কিন্তু রাজকন্যা সপ্তমীর গুণের শেষ নেই। ও একটি রাত আমাকে এমন যত্ন করেছে যে আমি রাজকন্যা সপ্তমীর কথা ফেলতে পারলাম না। রাজপুত্রদের ছেড়ে দিয়ে তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

সভা ভাঙ্গল। সবাই যে যার বাড়ি ফিরে চলল।

রাজাও তার ছয় রাজপুত্র আর রাজকন্যা সপ্তমীকে নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরলেন। কাকতাড়ানী রানী আর কাকতাড়ানী নয়, এখন সে পাটরানী।

সন্ন্যাসী বুড়ির কথামত তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে পড়ল। বুড়ি আর জঙ্গলে থাকে না, ডাইনীগিরিও করে না। বুড়ি আজকাল রাজবাড়িতেই থাকে, ছোটরানীর কাছে। রাজকন্যা সপ্তমীকে ছেড়ে জঙ্গলে ফিরে যেতে তার মন আর কিছুতেই চায় না।

রাজকুমার এককড়ি

রাজার খুব বাগানের শখ। যেমন তাঁর ফুলের বাগান তেমনি ফলের বাগান। ফুলের বাগানে নিত্য নানা রকমের ফুল ফোটে। গোলাপ, জুঁই, চামেলী, হাসনুহানা, মালতী, রজনীগন্ধা আরও কত কত ফুল। রাজার ফলের বাগানও তেমনি ভাল। আম, জাম, পেয়ারা, বেদানা, কমলালেবু, আঙ্গুর কত রকমের ফল সেখানে ফলে থাকে। ফুলবাগানের ফুলগুলো যেমন সব থেকে সেরা, ফলবাগানের প্রতিটি গাছের ফলও তেমনি ভাল, খুব বড় বড় আর মিষ্টি। কিন্তু কিছুদিন হল রাজার ফুলবাগানে সকাল হতে না হতেই একটাও ফুল থাকে না, ফলবাগানে একটাও ফল থাকে না। সন্ধ্যের আগে রাজা দেখলেন তাঁর ফুলবাগানের ফুলগুলো সকালেই ফুটবে, ফলবাগানের ফলগুলি সকালে পুরোপুরি পাকবে। ওমা, সকালে রাজা বাগানে এসে দেখলেন তাঁর বাগানে ফুলও নেই, ফলও নেই।

তাই রাজা ফুলবাগানের একটা ফুলও পান না, ফলবাগানের একটা

পাকা ফলও পান না। রাজা তাঁর বাগান ছুটোতে অনেক পাহারার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে রাজা তাঁর সারা রাজ্যে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন, যে তাঁর ছুটো বাগানের চোর ধরে দেবে তাঁকেই তিনি রাজ্য দেবেন। রাজা মারা যাবার পর সে-ই রাজত্ব করবে।

এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজার বড় দুই ছেলেও এ খবর শুনল। রাজার কিন্তু তিন ছেলে। ছোট ভাই অন্য দুই ভাই থেকে একটু অন্যরকম। খুব ভালমানুষ। সবার সঙ্গে তার ভাব। যদিও বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে পাঠশালা যায়, তারপর তীর চালানো শেখে, তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতে শেখে, ঘোড়ায় চড়তে শেখে কিন্তু যখনই ছুটি পায় তখনই চলে যায় তার রাখাল বন্ধুর কাছে। রাখাল বন্ধুর কাছে ছোট রাজকুমার বসে বসে বাঁশী শোনে কখনও আবার বাঁশী বাজাতেও শেখে। আবার কখনও চলে যায় পটুয়া বন্ধুর কাছে। তার কাছে বসে বসে এক মনে ছবি আঁকা দেখে, ছবি আঁকা শেখেও। ছোট রাজকুমার কিন্তু কখনও শিকার করতে যায় না। শুধু শুধু পশু-পাখি মারতে তার ভারি খারাপ লাগে।

বড় দুই ভাই তাই সবসময় বলে, "কি বোকারে তুই ছোট।"

"কেন? কেন?"

"ঐ সব গেঁয়ো রাখাল, পটুয়াদের সঙ্গে তোর মিশতে ভাল লাগে, অথচ শিকার করতে তোর ভাল লাগে না।"

"বারে, কি সুন্দর বাঁশী বাজায় আমার রাখাল বন্ধু, আর আমার পটুয়া বন্ধুর আঁকা ছবি দেখলে তোমাদেরও ভাল লাগবে।"

"থাক থাক, তোকে আর নিজের বন্ধুদের কথা বলতে হবে না। যেমন তুই তেমনি তোর বন্ধুরা।"

দাদাদের কথা শুনে ছোট রাজকুমারের খুব কষ্ট হয় কিন্তু কিছু বলে না।

এদিকে বড় দুই রাজকুমার ঢোলের বাজনা শুনে, রাজা যে খবর চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সে খবর পেয়েই, রাজার কাছে এসে বড়

রাজপুত্র বলল, “বাবা আগে আমরা তুজন তোমার বাগান পাহারা দেব। প্রথমে আমি, আমি যদি না পারি তোমার ফুল-বাগানের, ফল-বাগানের চোর ধরতে তাহলে মেজো-রাজপুত্র পাহারা দেবে। আমাদের তুজনের কেউ যদি চোর ধরতে না পারি তবেই তুমি অন্য কাউকে নিয়োগ করবে চোর ধরতে।”

রাজা বললেন, “ঠিক আছে, তাই হবে।”

বড় রাজকুমার সেদিন সন্ধ্যে হতেই ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে, পিঠে তীর-ধনুক নিয়ে বাগানে পাহারায় এল। সারা রাত জেগে বসে আছে একটা গাছের নিচে চোর ধরবে বলে। বসে বসে শেষ রাতের দিকে কখন চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়, লাল গোলাপ, সোনালী গোলাপ, আগুন রংয়ের গোলাপ আর যত ভাল ফুল ছিল সব আর ফলের বাগানের থোকা থোকা আঙ্গুর, ভাল-ভাল আম, কলা সব ফল উজাড় করে চোর চুরি করে নিয়ে পালালো।

সকালবেলা চারদিকে আলো ঝলমল করছে, রাজা এসেছেন বাগানে। আজ তাঁর বড় ছেলে রাত জেগে বাগান পাহারা দিয়েছে। নিশ্চয়ই ফুল, ফল কিছু চুরি যায়নি। রাজা তাঁর সাধের বাগানে ঢুকে যা দেখলেন তাতে তাঁর প্রায় চোখে জল এল। ফুল বাগানে একটি ফুল নেই, ফলের বাগানে একটি ফল নেই। সব চুরি হয়ে গেছে।

বড় রাজকুমারও তখন চোখ খুলে চারদিকে তাকিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সামনে দেখে তার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আর রাগী-রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। বড় রাজকুমার মাথা নিচু করে বাগান থেকে বের হয়ে এল।

মেজো রাজকুমার সব শুনে বলল, “তুমি তুঃখ কর না দাদা, আজ আমি বাগান পাহারা দেব আর ঠিক চোর ধরবই।” বিকেল হতেই সেও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে বাগানে চলে এল। তখন থেকেই শুরু করে হাঁটা। তুটো বড় বড় বাগান হেঁটে হেঁটে জেগে রইল। রাত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর হাঁটা যাচ্ছে না। মেজো রাজকুমার ভাবল এবার একটু বসি, কিন্তু যেই বসা অমনি চোখ বুজে গেল।

পাখি ডাকছে, আলো ফুটে উঠেছে, মেজো রাজকুমার তাড়াতাড়ি চোখ খুলেই উঠে দাঁড়াল, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে, বাগানে একটা ফুলও নেই, ফলও নেই। মাথা নিচু করে সেও ফিরে এল রাজবাড়ি।

সকালে ছোটরাজপুত্র খেতে বসে বড় দুই দাদাকে দেখতে পায় না। "দাদারা কোথায় গেল?" বলে খাবার রেখে ছোট রাজকুমার এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রাজবাড়ির শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানে একটা অন্ধকার মত ঘরে এসে দেখে বড় রাজকুমার আর মেজ রাজকুমার মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছে।

"আরে বড়দাদা, মেজোদাদা কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছ কেন?"

চোখের জল মুছে বড়ভাই বলল, "আমাদের দুঃখ তুই কি বুঝবি?"

"দুঃখটা কি তাই বল না।"

"রোজ রোজ বাগানের ফুল, ফল সব চুরি হয়ে যাচ্ছে জানিস্ ত'?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"বাবা ঢোল বাজিয়ে সারা রাজ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যে চোর ধরে দেবে তাকেই তিনি তাঁর মরার পর সমস্ত রাজ্য দিয়ে যাবেন। আমরা পর পর দুদিন দুজনে চোর ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। তাই আমাদের দুজনের কেউ রাজা হতে পারব না। এখন আমাদের দুঃখ বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই।"

"তোমরা রাজা না হতে পারলে খুব দুঃখ হবে বুঝি তোমাদের?"

"আচ্ছা বোকারাম তুই, আমরা রাজার ছেলে, বাবার পর আমরাই ত' রাজা হব। অন্য কেউ রাজা হবে এ আমাদের কি করে সহ্য হবে।"

"দাদা, আমি তোমাদের জন্য এক কাজ করতে পারি।"

"কি কাজ শুনি?"

"আজ রাতটা আমি বাগানটা পাহারা দেব।"

"তারপর?"

"যদি চোর ধরতে পারি তাহলে রাজ্যটা বাবা আমাকে দেবেন তখন আমি তোমাদের দিয়ে দেব। তাহলে আর তোমাদের কোন দুঃখ

থাকবে না।”

“তুই গিয়ে ত সারারাত বাগানে ঘুমাবি। রাজা হওয়া আমাদের ভাগ্যে জুটছে না।”

“আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখিই না।”

“যা দেখ গে।” মুখ বেঁকিয়ে দুই ভাই বলল।

ছোট রাজকুমার রাজার কাছে এসে বলল, “বাবা, আজ রাতে আমি বাগান পাহারা দেব।”

রাজা বললেন, “তোর বড় দুই ভাই পারল না আর তুই পারবি ? আচ্ছা, যখন তোর শখ হয়েছে তখন আজ রাতটা তুই বাগানটা পাহারা দে।”

ছোট রাজকুমার তখনই ছুটল তার রাখাল বন্ধু আর পটুয়া বন্ধুর কাছে। ওদের কাছে গিয়ে বলল, “দেখ, তোরা নিশ্চয়ই জানিস্ রাজার ফুল বাগানের ফুল আর ফল বাগানের ফল রোজ রাতে চুরি হয়ে যায়। রাজা ঢোল বাজিয়ে চারদিকে খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে রাজ-বাগানের ফুল ও ফলের চোরকে ধরে দিতে পারবে তাকে রাজা নিজের পর রাজা করে দিয়ে যাবেন। আমার বড় দুই ভাই দুই রাত জেগে চোর ধরতে পারেনি। আজকে আমি তাই চেষ্টা করব চোর ধরতে পারি কিনা। তোমাদের দুজনকেও কিন্তু আমার সঙ্গে বাগান পাহারা দেবার সময় থাকতে হবে।”

“নিশ্চয় আমরা থাকব।” দুই বন্ধু একসঙ্গে বলল।

“রাখাল বন্ধুভাই, তুমি কিন্তু তোমার বাঁশীটা সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর পটুয়া বন্ধুভাই—তুমিও তোমার রং তুলি নিয়ে যেও। সন্ধ্যের একটু আগে বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে থেকো, আমিও সে সময় চলে আসব।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা নিশ্চয়ই আসব।”

বিকেলবেলা, চারদিকে অন্ধকার নেমে আসার আগে ছোট রাজকুমার বাগান পাহারা দিতে বসল। কিন্তু ছোট রাজকুমারের হাতে ঢালও নেই, তলোয়ারও নেই, তীর-ধনুকও নেই। সারাদিন বসে

রসে সে মস্ত বড় একটা ফাঁস তৈরী করেছে, সেটা সঙ্গে নিল আর কিছু শক্ত দড়ি।

ছোট রাজকুমার, রাখাল-বন্ধু আর পটুয়া-বন্ধু তিনজনে বাগানে ঢুকল। তারপর বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ এক জায়গায় যেখানে জড়ো হয়ে আছে সেই অন্ধকার জায়গায় গিয়ে ওরা বসল। সেদিন পূর্ণিমার মত চারদিকে ফুটফুটে আলো, কিন্তু তিন বন্ধু যেখানে বসে আছে সে জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। তিন বন্ধুকে প্রায় দেখাই যায় না।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ছোট রাজকুমার বলল, "এখন বেশ রাত হয়েছে, আমরা তিনজন এস এখানেই শুয়ে পড়ি।"

রাখাল-বন্ধু বলল, "আরে শুলেই যে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।"

"চুপ করে শুয়ে থাকতেই হবে, তা না হলে চোর আমাদের বসে গল্প করতে দেখলে বাগানে ঢুকবেই না, আর আমরা চোর ধরতেও পারব না। তাই এস, শুয়ে পড়ি কিন্তু একজন ঘুমালে অন্যজন তাকে চুপি-চুপি জাগিয়ে দেবে।"

আরও কিছুক্ষণ সময় কাটল। খুব কষ্ট হচ্ছে তবু তিনজন জেগে আছে। হঠাৎ সাঁই-সাঁই-সাঁই। ঝটপট-ঝটপট ঝপাৎ। একটা মস্তবড় পক্ষীরাজ ঘোড়া নেমে এল বাগানে। তার পিছন পিছন আরও অনেক পক্ষীরাজ ঘোড়া। যেই না ওরা বাগানে নেমেছে ছোট রাজ-কুমার বলল খুব চুপিচুপি, "রাখালবন্ধু, রাখালবন্ধু বাঁশীতে তোমার ঘুমপাড়ানীয়া গান বাজাও।" রাখাল-বন্ধু উঠে বসেই বাঁশীতে ঘুমপাড়ানীয়া গান বাজাতে শুরু করল। আর যেই বাঁশী বাজতে শুরু হল একটাও পক্ষীরাজ ঘোড়া নড়তে পারে না, চড়তেও পারে না। সবার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। ছোট রাজকুমার তখন পটুয়া-বন্ধুকে বলল, "তুমি ভাই চট্ করে এদের একটা সুন্দর ছবি এঁকে ফেল। রং তুলি সবই ত তোমার কাছেই আছে।" পটুয়া-বন্ধু তার কাজে লেগে গেল। ছোট রাজকুমার এবার ফাঁস আর দড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়াদের সর্দারের পিছন থেকে ফাঁসটা ছুঁড়ে বেঁধে

ফেলল পক্ষীরাজ ঘোড়া-সর্দারকে। পক্ষীরাজ ঘোড়া-সর্দার গলার ফাঁসটা খোলার জন্য টানাটানি শুরু করল কিন্তু তাতে ফাঁস গেল আরও আটকে। ছোট রাজকুমার রাখালবন্ধুকে বলল, "তোমার বাঁশী থামাও এবার।" বাঁশী থামল। পক্ষীরাজ ঘোড়াদের ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেছে। কিন্তু সর্দার-পক্ষীরাজ ঘোড়া এগোয় না, অন্য পক্ষীরাজ ঘোড়ারাও এগোতে পারে না। সর্দার-পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল, "ছোট রাজকুমার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার কাছে হেরে গেছি।"

ছোট রাজকুমার বলল, "তোমরা বাবার বাগানের সব ফুল, ফল রোজ খেয়ে চলে যাও। আমি তোমাদের বাবার কাছে ধরে নিয়ে যাব। বাবা তাঁর ইচ্ছে মত তোমাদের শাস্তি দেবেন।"

পক্ষীরাজ ঘোড়াদের সর্দার বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও, তার বদলে তুমি কি চাও, ধন-সম্পত্তি, রাজ্য···।"

ছোট রাজকুমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমার কিছু চাই না। এ বাগান দুটো বাবার খুব শখের। তোমরা বাবার এ বাগান দুটো নষ্ট করে দিচ্ছ। বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আচ্ছা, কি করতে হবে এর জন্য তাই বল। আমরা তাই করব।"

"বাগানটাকে আগের মত সুন্দর করে দাও। আর কোনদিন এ বাগানে আসবে না প্রতিজ্ঞা কর।"

"তাই হবে। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দড়ির ফাঁস আমার গলায় এত জোরে আটকে আছে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বড় কষ্ট হচ্ছে।" সর্দার-পক্ষীরাজ ঘোড়া যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ছোট রাজকুমার সর্দার-পক্ষীরাজের কষ্ট দেখে আর থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি গলা থেকে দড়ির ফাঁসটা খুলে দিল। তারপর তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল, "তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম পক্ষীরাজ। আমার উপর রাগ কর না। এখন তুমি ও তোমার বন্ধুরা চলে যাও।" সর্দার-পক্ষীরাজ ঘোড়ারও খুব ভাল লেগে গেছে ছোট রাজকুমারকে। বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি আর তোমাকে কথা দিচ্ছি আর কখনও এখানে আসব না। তুমি যে বন্দী না করে ছেড়ে দিলে এমনি এমনি, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি নিজের জন্য কিছু চাও।"

"আমার কিছুই চাই না, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তাতেই আমি খুব খুশি।"

"আমার যে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, আমার ল্যাজের কিছু সাদা চুল তোমার কাছে রাখ। যদি কখনও কোন বিপদে পড়, আমাকে দরকার হয়, এই চুলগুলির একটা চুল নিয়ে সূর্যের আলোর কাছে ধরলেই আমি তখনই চলে আসব তোমার কাছে। আমরা এখন যাচ্ছি।" বলতে বলতে পক্ষীরাজ ঘোড়ার দল তাদের বড় বড় সাদা ডানা মেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে দূরে মিলিয়ে গেল। সকাল হয়ে আসছে তখন।

সকাল হয়েছে, রাজা বাগানে এসেছেন। অবাক হয়ে তিনি আজ

চারদিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর ফুলের আর ফলের বাগানের একটিও ফুল বা ফল নষ্ট হয় নি, কেউ ছিঁড়ে নিয়ে যায়নি। বাগান দুটো যেন আরও বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। ফুলের বাগানে নানা রকম ফুল ফুটে আছে। চারদিক আলোয় আলো, সুগন্ধে ভরপুর। ফলের বাগানে প্রতিটি গাছে এত ফল ধরেছে যে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে।

রাজা খুশি হয়ে ছোট রাজকুমারকে কাছে ডাকলেন। ছোট রাজকুমার তার পটুয়া বন্ধুর কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে রাজার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, "বাবা, এই দেখছ পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলোকে, এরাই তোমার ফলের বাগানের ফল, ফুলের বাগানের সব ফুল খেয়ে ফেলত।"

"কিন্তু আজ ত দেখছি কিছু খেতে পারে নি!" ছবিটা দেখে রাজা বললেন।

"বাঃ, কি করে করবে! যেই ওরা বাগানে নেমেছে আমি দড়ির ফাঁস দিয়ে ধরে ফেললাম যে ওদের সর্দার-পক্ষীরাজ ঘোড়াকে।"

"ছেড়ে দিলে কেন? ফের যদি ওরা আবার আসে?"

"না, বাবা, ওরা প্রতিজ্ঞা করে গেছে আর কখনও তোমার বাগানে আসবে না। তাই ছেড়ে দিলাম।"

রাজা খুশি মনে রাজবাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ি এসেই রাজা প্রহরীকে ডেকে বলে দিলেন, "প্রহরী, এখনই ঢোল বাজিয়ে রাজ্যের চারদিকে ঘোষণা করে দাও যে আমার পর ছোট রাজকুমার দেশের রাজা হবে। আমার ফলের বাগান ও ফুলের বাগানের চোর পক্ষীরাজ ঘোড়ারা ধরা পড়েছিল ছোট রাজকুমারের হাতে। তারা প্রতিজ্ঞা করে গেছে আর কোনদিন বাগানের ফুল-ফল খেতে আসবে না।"

প্রহরী ঢোল হাতে রাজবাড়ী থেকে বের হয়ে ঘোষণা করতে শুরু করে দিল।

ছোট রাজকুমার রাজার সঙ্গে কথা বলে ফিরে চলেছে বাগানে তার রাখাল বন্ধু আর পটুয়া-বন্ধুর কাছে। বাগানের কাছে এসে দেখে ওরাও বের হয়ে আসছে বাগান থেকে। ছোট রাজকুমার তাদের বলল, "তোমরা এখন বাড়ি যাও আমি বিকেলে তোমাদের কাছে যাব।"

ছোট রাজকুমার বন্ধুদের এসব কথা বলে রাজবাড়ির দিকে চলল।

রাজবাড়ীর সামনে এসে দেখে তার বড় দুই ভাই রাজবাড়ী ছেড়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

"ও দাদারা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি কোথায়, তাতে তোর কি? তোর মত বোকারাম রাজা হবে তাই আমরা ঠিক করেছি এখানে থাকব না।"

"বারে, তোমরা না থাকলে আমিও এখানে থাকব না। তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল। তাছাড়া আমি ত রাজা হতে চাই না, তোমরাই রাজা হয়ো।"

তখন মেজো রাজকুমার বলল, "আরে, আমরা যাচ্ছি জোছনা দেশের রাজকন্যাকে খুঁজে আনতে। আগুনমুখো রাক্ষস তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। জোছনা দেশের রাজা সব দেশে তাই জানিয়ে দিয়েছে, যে রাজকন্যাকে আগুনমুখো রাক্ষসের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে তাকে তিনি তাঁর জোছনা রাজ্যটা দিয়ে দেবেন সঙ্গে রাজকন্যাকেও। আমরা তাই আগুনমুখো রাক্ষসটার কাছ থেকে জোছনা রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি।"

"বেশ ত আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

বড় রাজকুমার বলল, "আমাদের সঙ্গে যেতে হলে তোকে আমাদের চাকর হয়ে যেতে হবে। আয় তোকে এক কড়ি দিয়ে কিনে নি'।" বলে বড় রাজকুমার কোমরের কাপড়ে বাঁধা কড়িগুলো থেকে একটা কড়ি বার করল। তারপর তরোয়াল দিয়ে কড়িটা ফুটো করে তাতে একটা কালো সুতো বেঁধে ছোট রাজকুমারের গলায় পরিয়ে দিল।

মেজো রাজকুমার বলল, "তোকে আমরা একটা কড়ি দিয়ে কিনলাম, তাই তোকে আজ থেকে যা বলব তাই করতে হবে। আমরা যেখানে যখন থাকব সেখানেই তোকেও থাকতে হবে। আমাদের জন্য রান্নাবান্নাও করতে হবে, তাছাড়া বাসন মাজা কাপড় কাচা আমাদের সব কাজও আজ থেকে তোকেই করতে হবে।"

"ঠিক আছে আমি তোমাদের কেনা চাকর, যা বলবে তাই করব।

তবু আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাবই।'

যেতে, যেতে, ওরা তিনজন এক অদ্ভুত দেশে পৌঁছাল। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর সবুজ দেশ। দিনের বেলা সূর্যের আলো ঝল্‌মল্‌ করে কিন্তু রাতে খুব অন্ধকার, চাঁদ উঠলেও সে অন্ধকার যায় না। দেখে শুনে ছোট রাজকুমার বলল, "ও দাদারা এ নিশ্চয়ই জোছনা রাজ্য।"

বড় দুই ভাই বলল, "তুই ছাই জানিস্‌।"

"তবু খবর নাও ত।"

যে শহরে পৌঁচেছে বড় দুই ভাই সেখানকার সকলকে জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, "এটা জোছনা রাজার দেশ। যবে থেকে জোছনা-রাজকন্যা চুরি হয়ে গেছে তবে থেকেই এ অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠলেও জোছনা থাকে না। রাতের অন্ধকার থেকেই যায়।"

বড় দুই ভাই ছোট রাজকুমার এককড়িকে নিয়ে অতিথিশালায় উঠল। সকাল হতেই বড় দুই ভাই সেজেগুজে সে দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। যাবার সময় ছোটভাইকে বলল, "এই এককড়ি, আমরা এখন যাচ্ছি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। তুই রান্নাবান্না করে রাখবি আমরা ফিরে এসে খাব।"

ছোট রাজকুমার কি আর করে, দাদাদের খাবারদাবার তৈরী করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দুই রাজপুত্র রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এল। তারপর খেয়েদেয়ে ছোট রাজকুমারকে বলল, "আমরা এখন আগুনমুখো রাক্ষস মেরে জোছনা রাজকন্যাকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। আমরা যতদিন না ফিরি তুই ততদিন এখানে থাকিস।"

ছোট রাজকুমার বলল, "দাদারা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না।"

বড়ভাই বলল, "এককড়ি দিয়ে কেনা চাকর, এত শখে কাজ নেই।"

দাদারা চলে গেল।

মনের দুঃখে ছোট রাজকুমারের একা একা সারাদিন কাটে। পরদিন

সকাল হ'তেই তার পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা মনে হল। ছোট রাজকুমার করল কি তার কোমরের কাপড়ে বাঁধা পক্ষীরাজ ঘোড়ার দেওয়া লেজের চুলগুলি থেকে একটা চুল নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে তুলে ধরল আর মনে মনে বলল, "ও পক্ষীরাজ ঘোড়া, তুমি কোথায় আছ? শীগগির চলে এস বন্ধু।" ওমা, একটু পরেই বাতাসে শন্-শন্-শন্ শব্দ। সুন্দর দুধ-সাদা একটা ঘোড়া মাটিতে নেমে এল।

ছোটরাজপুত্রকে দেখে পক্ষীরাজ বলল, "তুমি এখানে কি করছ?"

"আরে, আমার দাদাদের জন্য আমি মা-বাবা সব্বাইকে ছেড়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আমার দাদারা গেছে জোছনা-রাজকন্যাকে আগুনমুখো রাক্ষসটার কাছ থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনতে।"

"আগুনমুখো রাক্ষস!"

"হ্যাঁ, ঐ রাক্ষসটা যে জোছনা রাজকন্যাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"তুমি গেলে না কেন?"

"আমার ঘোড়া নেই। তাছাড়া আমার দাদারা আমাকে এককড়ি দিয়ে কিনেছে। ওরা তাই আমাকে বলে গেছে এখানে থাকতে। কিন্তু আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমাকে ঐ আগুনমুখো রাক্ষসটার কাছে নিয়ে যাবে?"

"আমি নিয়ে যেতে পারি তবে কাছাকাছি একদম যেতে পারব না কারণ রাক্ষসটা তাহলে আমাকে আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলবে।"

"দেখ ভাই পক্ষীরাজ, তোমার যখন এত কষ্ট হবে তখন তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি হেঁটেই যাব, একটু দেরিতেই নাহয় পৌঁছাব।"

"আরে না না, আমি তোমাকে নিয়ে যাবই। রাক্ষসটা থাকে একটা ঝর্ণার পাশে গুহার ভিতর। আমি ঝর্ণার পাশে তোমাকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি গুহায় গিয়ে রাক্ষসটার সঙ্গে যুদ্ধ করে মেরে ফিরে আসলে আমি তোমাকে পিঠে নিয়ে দেশে পৌঁছে দেব।"

"তুমি আগুনমুখো রাক্ষসটাকে দেখেছ?"

"কতবার, রাতে যখন রাক্ষসটা ঘুমোয় তখন রোজ আমি ঐ ঝর্ণার জল খেতে যাই। ঐ ঝর্ণার জল খুব মিষ্টি।"

"এখন বলত, রাক্ষসটা দেখতে কেমন ?"

"রাক্ষসটার তিনটে মাথা। মাঝেরটা মানুষের, ডানদিকের মাথা একটা কালো সাপ, বাঁদিকের মাথা হল হলদে বাঘ। ঐ সাপ আর বাঘের মাথা দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগুন বের হয়।"

"শরীরটা কেমন ?"

"শরীরটা! প্রকাণ্ড বড় একটা যেন কুমীর। আমাদের নদীর দশটা কুমীর ওর পেটে ঢুকে যাবে।"

"সেকি! কি ভয়ানক।"

"তবে বলছি কি, ওর পেটে কত খাবার আঁটতে পারে তার ঠিক নেই। কুমীরের মত দেখতে হলে কি হবে, রাক্ষসটা দুপায়ে হাঁটতে পারে, ছুটতেও পারে।"

"বন্ধু পক্ষীরাজ, আমি একাই যাই। তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

"তুমি ঐ দূর দেশে যাবে কি করে ? আমি তোমাকে পেঁাছে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব।"

"আচ্ছা চল।" ছোট রাজপুত্র পক্ষীরাজের পিঠে উঠে বসল। পক্ষীরাজ উড়ে চলল। একটু পরেই ওরা ঝর্ণার কাছে এসে পেঁাছল। পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নেমে ছোট রাজপুত্র পক্ষীরাজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, "বন্ধু আমাকে বয়ে তোমার কত কষ্ট হল।"

"আমি ত নিজে ইচ্ছে করেই তোমাকে বয়ে আনলাম। এই ঝর্ণাটার জল খুব মিষ্টি বলে যত জন্তু জল খেতে আসে রাক্ষসটা তাদের খেয়ে ফেলে। রাক্ষসটাকে তুমি যদি মেরে ফেল তবে সবাই আসবে এই ঝর্ণার জল খেতে নিশ্চিন্ত মনে।"

"তাহলে ত আমায় রাক্ষসটাকে মারতেই হবে।"

তখন সবে সকাল হয়েছে। পাখিরা সব ডাকাডাকি শুরু করেছে। কেউ ডাকছে, 'জাগ-জাগ, সবাই জাগ।' কেউ বলছে, 'আর ঘুমাস্‌নি, আর ঘুমাস্‌নি। এবার গান শুরু কর।'

ছোট রাজকুমার গুহার দিকে এগোল, একহাতে তরোয়াল অন্য হাতে বাঁশী নিয়ে। বাঁশীতে ঘুমপাড়ানীয়া সুর বাজছে। বাঁশীর সুরে

পাখিরা সব চুপ।

ছোট রাজকুমার গুহার কাছে চলে এসেছে। চারদিকে ভীষণ ধোঁয়া, আগুনের তাপ লাগছে গায়ে। রাক্ষসটা সবে ঘুম থেকে উঠে গুহার বাইরে আসছিল, বাঁশীর সুরে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে কি হবে তার সাপ আর বাঘের মাথার নাক-মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে।

ছোট রাজকুমার বাঁশী থামিয়ে প্রথমেই দিল মানুষের মাথাটা কেটে। সব দুষ্টুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ঐ মাথাটা থেকেই বার হয়। কিন্তু মানুষের মাথাটা কাটলে কি হবে আরও দুটো মাথা রয়েছে রাক্ষসটার। বাঁশী থামতেই প্রথমে বাঘের-মাথাটা তেড়ে এল। কি রাগ তখন বাঘ-মাথাটার, নাক-মুখ দিয়ে আগুন ছুটে আসছে। ভীষণভাবে পুড়িয়ে ফেলে আর কি ছোট রাজকুমারকে। ছোট রাজকুমারের গা-হাত ঝলসে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু তারই মধ্যে ছোট

রাজকুমার রাক্ষসের বাঘ-মাথাটা কেটে ফেলল। মাথাটা গড়িয়ে পড়ল মানুষ-মাথাটার কাছে। রাক্ষসটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি, হিস্-হিস্, ফোঁস-ফোঁস করতে করতে সাপ-মাথাটা তুলছে, ছিটকে ছিটকে পড়ছে আগুন। এর মধ্যে রাক্ষসটার সমস্ত শরীর গুহার বাইরে চলে এসেছে। বিরাট কুমীরের মত চেহারা, প্রকাণ্ড লেজটা আছড়াচ্ছে। হঠাৎ রাক্ষসটা তার লেজ দিয়ে খুব জোরে মারল ছোট রাজকুমারকে। ছোট রাজকুমার রাক্ষসটার প্রায় পেটের কাছে মাটিতে পড়ে গেল। আর যায় কোথায় রাক্ষসটার আগুন-ঝরা সাপ মাথাটা হাঁ করে গিলতে এল ছোট রাজকুমারকে। ছোট রাজকুমার উঠে সোজা তার মস্ত তরোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল রাক্ষসটার বুকে। তারপর নিচের দিকে টানতে লাগল, পুরো পেটটাই দিল ফাঁক করে। সাপ মাথাটা এলিয়ে পড়েছে, নাক-মুখ দিয়ে আগুন ঝরা বন্ধ। রক্তে চারদিকে থৈ-থৈ করছে।

ছোট রাজকুমার এবার সোজা চলে এল গুহার ভিতর। গুহার একটা ছোট্ট ঘর। বাইরে থেকে ঘরটার দরজা বন্ধ। ছোট রাজকুমার

খুব জোরে ধাক্কা দিল দরজায়, দরজা খুলে গেল। দরজা খুলতেই চারদিক আলোয় আলো। ছোট রাজকুমার দেখে একটি মেয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে, খুব কাঁদছে কিন্তু তার সারা গা থেকে সুন্দর জোছনার আলো ঝরে পড়ছে। ছোট রাজকুমার বুঝল এ-ই জোছনা-রাজকন্যা।

"রাজকন্যা, রাজকন্যা কেঁদ না। আমি রাক্ষসটাকে একদম মেরে ফেলেছি। এখন চল তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দি।"

জোছনা-রাজকন্যা ত বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসটাকে কেউ মারতে পারে। তবু ছোট রাজকুমারের কথায় সে বাইরে এসে অবাক। রাক্ষসটার তিনটে মাথা, বিরাট শরীর পড়ে আছে। চারদিক রক্তে থৈ-থৈ। ছোট রাজকুমার জোছনা-রাজকন্যাকে নিয়ে ঝর্ণার কাছে চলে এল। পক্ষীরাজ ছোট রাজকুমারকে দেখে আনন্দে বলে উঠল, "আমি জানতাম তুমি ঠিক পারবে। এস, এখন তোমাদের জোছনা রাজ্যে পৌঁছে দি। কিন্তু তার আগে বন্ধু তুমি ঝর্ণার জলে চান করে নাও। তাহলে এখনই তোমার গায়ের পোড়া ঘাগুলি শুকিয়ে যাবে।" পক্ষীরাজের কথায় ছোট রাজকুমার ঝর্ণায় চান করতে জলে নামল। আর যেই জল থেকে উঠেছে দেখে গায়ে একটুকুও পোড়া দাগও নেই।

আগুনমুখো রাক্ষসটার আগুন-নিঃশ্বাসে চারদিক জ্বলেপুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই রাক্ষসটার রক্তের ছোঁয়া লেগেছে মাটিতে চারদিক আবার সুন্দর সবুজ হয়ে উঠল।

ছোট রাজকুমার আর জোছনা-রাজকন্যাকে নিয়ে পক্ষীরাজ ফিরে এসেছে জোছনা রাজ্যে। রাজ্যময় হৈ-চৈ, জোছনা দেশের রাজা বেজায় খুশি। তিনি তখনই ছোট রাজপুত্রকে নিজের রাজ্য দিতে চাইলেন। কিন্তু ছোট রাজকুমার কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এল জোছনা রাজার ধর্মশালায়। এসেই দেখে তার বড়দাদারা জোছনা রাজকন্যাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসেছে। আর ছোট রাজকুমারের উপর খুব রেগে আছে। কারণ ছোট রাজকুমার আগুনমুখো রাক্ষসটাকে মেরে জোছনা রাজ-

কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে দেখেই বড় রাজকুমার আর মেজো রাজকুমার এক সঙ্গে বলে উঠল, "তুই আমাদের এককড়ি দিয়ে কেনা চাকর, তোকে না বলে গিয়েছিলাম এখানে থাকতে। কেন আমাদের কথা না শুনে আগুনমুখো রাক্ষসকে মারতে গেলি? এখন আমরা দুজনে তোকেই মেরে ফেলব।"

"ও বড়দাদা, ও মেজদাদা তোমরা রাগ কোরো না। আমার একা একা ভাল লাগছিল না তাই গিয়েছিলাম আগুন-মুখো রাক্ষসটাকে মারতে আর জোছনা-রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। জোছনা-রাজকন্যার বাবা-মার কত কষ্ট হচ্ছিল বলতো। তাছাড়া ভালই ত হল, বাবা আমাকে নিজের রাজ্য দেবেন আর জোছনা রাজাও আমাকে তাঁর রাজ্য দেবেন। তোমরা দুজনে দুটো রাজ্য নিয়ে নাও। শুধু তোমরা এবার আমাকে ছেড়ে দাও।" হলও তাই।

বড় রাজকুমার ফিরে যাবে তার বাবার রাজ্যে। ছোট রাজকুমার
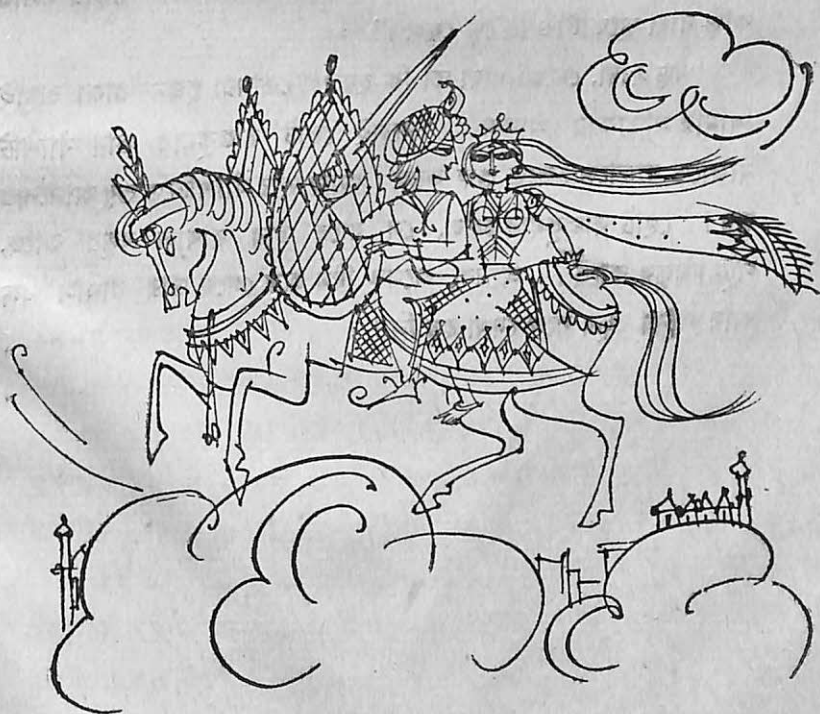
চিঠি লিখে দিল, "বাবা, যে রাজ্য তুমি আমাকে দেবে বলেছিলে তা তুমি বড়দাদাকে দিয়ে দিও। আমি রাজা হতে চাই না। বড়দাদা রাজা হলেই আমার আনন্দ। তুমি ও মা আমার শতকোটি প্রণাম নিও।"

মেজো রাজপুত্র পেল জোছনা রাজ্য। ছোট রাজকুমার জোছনা-রাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আপনি আপনার রাজ্য আর রাজকন্যা জোছনাকে ত আমায় দান করতে চাইছেন, আমার ইচ্ছা আমার মেজো দাদাকে আপনি এসব দান করুন। ও আমার দাদাই শুধু নয় সবদিক থেকে আমার চেয়ে অনেক ভাল।"

ছোট রাজকুমার এত করে বলায় জোছনা রাজাও রাজি হয়ে গেলেন। বড় রাজকুমার আর মেজো রাজকুমার এবার কিন্তু ভীষণ লজ্জা পেল। তারা বলল, "এই ছোট, তুই এত ভাল বুঝতে পারিনি আমরা, আমাদের রাজা হয়ে দরকার নেই। ও দুটো রাজ্য তোরই থাক। বরং তুই আমাদের উপর রাগ করে থাকিস না। তোর গলার কড়ি বাঁধা সুতোটাও ছিঁড়ে ফেল।"

"বড় দাদা, মেজো দাদা তা কি হয়! তোমরা দুজন রাজা হলেই আমার সত্যিকার আনন্দ।" বলেই ছোট রাজকুমার তার বাঁশিটি বাজাতে বাজাতে চলতে শুরু করল। আজ তার বাঁশিটিতে শুধু আনন্দের সুর। ছোট রাজকুমার চলল, সে যাবে তার রাখাল বন্ধুর কাছে, পটুয়া বন্ধুর কাছে। অনেক, অনেক দিন হয়ে গেছে তার রাখাল বন্ধু আর পটুয়া বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

বনদেবী

বনটা যেখানে সবে শুরু হয়েছে, সেইখানে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা বট আর একটা অশ্বত্থ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল। একই জায়গায় একই সঙ্গে ওরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠেছে। খুব ছোটবেলা থেকে তুজনের খুব ভাব ছিল। একটু বাতাস উঠলেই একে অন্যকে নিজেদের রোগা রোগা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরত। একজন অন্যজনের মাথার চুলগুলো গুছিয়ে দিত নরম নরম পাতার আঙুলে। কিন্তু একটু বড় হবার পর থেকেই তুজনের খুব ঝগড়া।

"আচ্ছা বট, তুই কি ভেবেছিস বল্‌ত, চারদিকের জায়গা শুধু তুই একাই জুড়ে থাকবি, হাত-পা ছড়াবি আর আমি একটু ভাল করে দাঁড়াতেও পারব না।"

"তুই যে মাটির সব রস টেনে নিচ্ছিস, আর আমি যেটুকু খাবার জোগাড় করছি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার খাবারও কেড়ে খেয়ে নিচ্ছিস, তার বেলা ?"

এমন সময় খুব জোরে একটা দমকা বাতাস ছুটে এল, আবার শুরু হল মারামারি। বট তার ডাল দিয়ে অশ্বত্থের মাথায় এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করে দিল, অশ্বত্থও বটের সারা গা আঁচড়ে কামড়ে একসা করে দিল।

এদিকে হয়েছে কি, এ বনের কাছে থাকত এক কাঠুরে। কাঠুরে রোজ জঙ্গলে যেত আর গাছ কেটে বাজারে এনে বিক্রি করত। একদিন সকালে আকাশের লাল সূর্যটা যেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে কাঠুরেও তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠল, বৌকে বলল, "দেখ্ আজ খুব সকালেই বনে যাব, অনেক কাঠ কাটব। বুঝলি দু পয়সা বেশি রোজগার করতে হবে, ঘরটাতে এবার নতুন খড় দেব ঠিক করেছি।"

কাঠুরের বৌ তাড়াতাড়ি উঠে রুটি করে কাঠুরের গামছায় বেঁধে দিয়ে বলল, "খিদে পেলে খেয়ে নিস্ কাঠুরে।"

কাঠুরে কাঁধে কুড়ুল নিল, রুটি বাঁধা গামছা নিল, হাতে নিল মস্ত বড় দড়ি ; তারপর রওনা দিল।

কাঠুরের বাড়ি থেকে একটু হাঁটলেই গভীর বন, তারপর পাহাড়। কাঠুরে হাঁটতে হাঁটতে বনের কাছে এল। কাঠুরে প্রথমে বনের ভিতর ঢোকে। এক গহন বন, তাতে সবে সকাল হয়েছে, ভাল করে কিছুই দেখা যায় না। কাঠুরে সেই আবছা আলোতে এগাছ সেগাছ দেখে কোন গাছই পছন্দ করতে পারে না, শেষে বন থেকে বের হয়ে আসে। তারপর বট অশ্বথ দুটো গাছ যেখানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার নিচে এসে বসে ভাবে, একটু ভাল করে আলো হোক তারপর বনে ঢুকব। হঠাৎ খেয়াল হয়, আরে এই তো মস্ত গাছ। কাঠুরে ভাল করে গাছ দুটোকে দেখে। —তাইতো, দুটো মস্ত মস্ত গাছ এক জায়গায়। এত বড় দুটো গাছ বনে খুব কমই আছে। আর কত কাঠ পাব তারও ঠিক নেই, একমাস দুমাস লেগে যাবে গাছদুটোর কাঠ ছোট ছোট করে কেটে বাজারে নিয়ে যেতে, অনেক পয়সা লাভ হবে। ঠিক, ঠিক এ-গাছ দুটোই কাটব, আর বনে ঢুকে গাছ খোঁজাখুঁজি করব না।

কাঠুরে দড়ি, গামছায় বাঁধা রুটি একপাশে রেখে কাপড় চোপড় গুটিয়ে গাছ কাটার জন্য তৈরি হল। কিন্তু যেই কাঠুরে তার কুড়ুল দিয়ে ঘা দিয়েছে অশ্বত্থগাছে, অশ্বত্থগাছ ব্যথা পেয়ে কেঁদে বটকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ও ভাই বট, আমাকে কেউ কুড়ুল দিয়ে কাটছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আমি মরে গেলাম।" কাঠুরে তার কুড়ুলের দ্বিতীয় ঘাটা দিয়েছে বটগাছে, বটও চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, "অশ্বত্থ ভাই, আমাকেও কেউ কুড়ুল দিয়ে কাটছে। আজ আমরা কেউ বাঁচব না।"

তখন অশ্বত্থ বলে, "আয় দুজনে মিলে মাকে ডাকি, মা যদি এসে কিছু করতে পারে।"

তারপর বট আর অশ্বত্থ দুজনে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "মা, ওমা তুমি কোথায়, তুমি আমাদের বাঁচাও। আমাদের মেরে ফেলছে, মাগো।"

কাঠুরে আবার যেই কুড়ুল তুলে বটগাছে ঘা দেয়, অমনি ভীষণ

কান্নার শব্দ, যেন কোন মেয়ে খুব কষ্টে জোরে জোরে কাঁদছে। কাঠুরেকে থামতে হল। এই বনে কে কাঁদে? মেয়েই বা এল কোথা থেকে এই বনে। কাঠুরে কাঠ কাটা বন্ধ রেখে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। এখন কিন্তু কান্নাটা আস্তে আস্তে হচ্ছে। কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঠুরে আবার কাঠ কাটার জন্য কুড়ুলের ঘা লাগায় অশ্বত্থের গায়ে। আবার চিৎকার করে কান্না শুরু করে। কাঠুরেকে আবার থামতে হয়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে।—নাঃ, কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কে কাঁদছে? শেষে কাঠুরের মনে হয়, এগাছে নিশ্চয়ই ভূত আছে। থাক বাবা, এগাছ কেটে কোন লাভ নেই, মাঝ থেকে বিপদে পড়ব। কাছেই ছিল একটা বড় নিম গাছ। কাঠুরে ভাবে, আর কি করা যাবে, এই বট অশ্বত্থ দুটো গাছ এক জায়গায় ছিল কাটলে অনেক কাঠ পাওয়া যেত, বাজারে বিক্রি করলে পয়সাও অনেক হত। এখন ভূতুড়ে গাছ কি করে কাটি। যাকৃগে এই নিমগাছটাই কাটি। সে নিমগাছটা কাটার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু যেই নিমগাছে কুড়ুলের ঘা দিয়েছে আবার সেই চিৎকার করে কান্না শুরু হয়ে যায়। কাঠুরে মহা মুস্কিলেই পড়েছে।—নাঃ, আজ আর কাঠ কাটা যাবে না দেখছি, নিশ্চয়ই বনের এখানে একদল ভূত এসেছে। এক কাজ করা যাক, এ জায়গাটা ছেড়ে এগোই, অন্য কোথাও গিয়ে গাছ কাটি।

কাঠুরে এগোতে থাকে, এগোতে এগোতে প্রায় পাহাড়ের গোড়ায় যে শিকারীর বাড়ি ছিল সেখানে চলে আসে। শিকারী নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসে তীর-ধনুক ঠিক করছিল। কাঠুরেকে দেখে শিকারী নিচে নেমে এসে বলে, "তুমি কে ভাই?"

কাঠুরে বলে, "আমি এই বনে রোজ কাঠ কাটতে আসি, আমার নাম ঝমরু। কিন্তু ভাই আজ কিছুতেই কাঠ কাটতে পারছি না।"

"আমার নাম বংশী।" শিকারী বলে, "কিন্তু কেন কাঠ কাটতে পারছ না?" কাঠুরে বলে, "আচ্ছা বংশী, তুমি আজ কোন কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?" একটু কান পেতে বংশী বলে, "ঐ যে আস্তে

আস্তে কান্নার শব্দ, মাঝে মাঝে আবার ফুঁপিয়ে কান্না! আমি ত কয়েক দিন ধরেই সারাক্ষণ শুনি। মাঝে মাঝে আবার খুব জোরে জোরে কেউ কাঁদে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো হয়েছে আমার অসুবিধা। আমি রোজ গাছ কাটি, তারপর কাঠ নিয়ে বিকেলে বাজারে বিক্রি করি। আজও এসেছি। কিন্তু যেই গাছে কুড়ুলের ঘা দিয়েছি, ওমনি কেউ যেন জোরে জোরে কেঁদে উঠল। ঐ গাছ ছেড়ে অন্য গাছ কাটতে শুরু করলাম। আবার শুরু হল চিৎকার করে কান্না। কি ব্যাপার বল ত, এখানে ভূত-টুত এসেছে নাকি ?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ত জঙ্গলেই থাকি, কদিন ধরে দিনরাত আস্তে আস্তে একটা কান্না শুনছি কিন্তু যেই কিছু শিকারের জন্য ধনুকে তীর লাগাচ্ছি তখনই কান্নাটা খুব জোরে শুরু হচ্ছে আর তীর ছুঁড়তেও পারছি না আমি, আমার হাত আটকে যাচ্ছে।" একটু চুপ করে থেকে বংশী বলে, "ভূত-টুত জানি না তবে কাল মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে এসে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি।"

"কি ?"

"পাহাড়ের মাথায় আলোয় আলো।"

"তাই নাকি ?"

"ঝমরুভাই, এক কাজ করলে হয় না? আজ রাতে আমরা দুজনে পাহারা দেব, যদি ফের পাহাড়ের মাথার আলো দেখা যায় তবে এক সঙ্গে ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পারি।"

"তাতো হতে পারে কিন্তু আমার বাড়ি যাওয়া হবে না তাহলে।"

"একটা দিন তুমি আমার কাছে থেকেই যাও না ভাই ঝমরু।"

ঝমরু বলে, "ঠিক আছে থাকব।"

তখন বংশী বলে, "জান একা যেতে সাহস হয় না যদি ভূতেরা থাকে। তুমি থাকলে ভাল হল। দুজনে মিলে যাব।"

কাঠুরে ঝমরু শিকারী বংশীর বাড়ি থেকে গেল। সারাদিন কত

সুখ দুঃখের কথা হল দুজনের। সন্ধ্যে হয়ে আসে, তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়। মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে—হাঁউ-হাঁউ, মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকছে—হুক্কা-হুয়া-হুয়া। মাঝে মাঝে বিদ্‌ঘুটে সব পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ বংশী বলে উঠল, "ঝমরু ভাই, দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, পাহাড়ের মাথায় কিরকম আলো, আকাশটা পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে।"
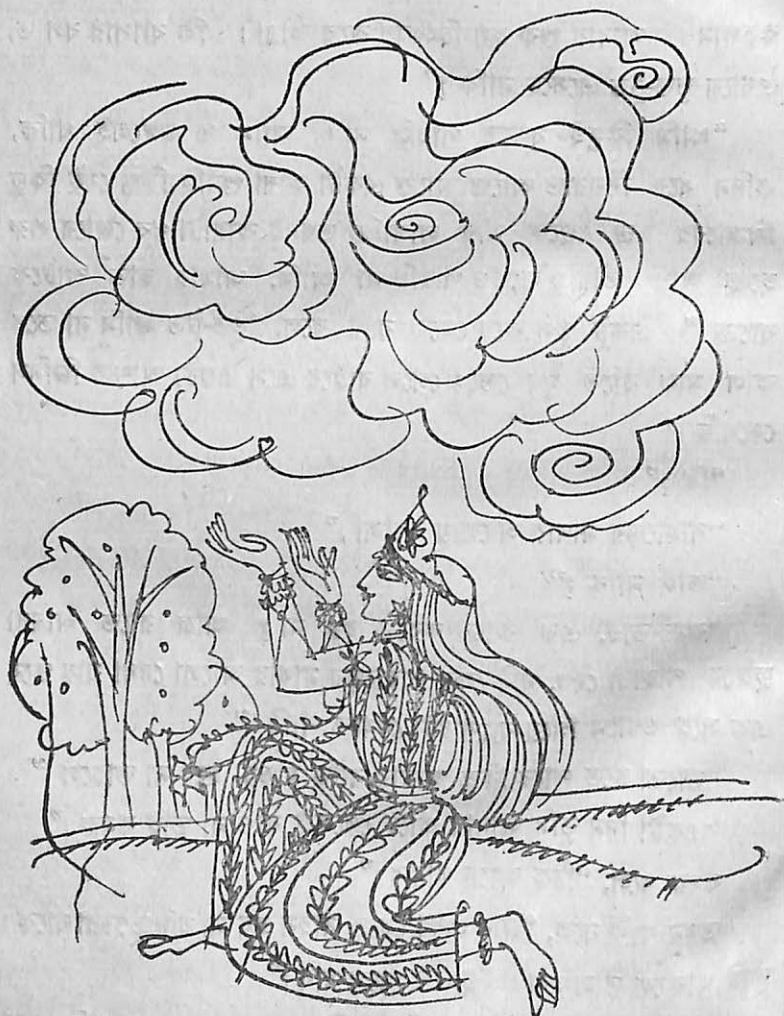
"তাইতো, চল এবার আমরা ওখানে যাই।"

"হ্যাঁ, এভাবে ভয়ে ভয়ে থাকা যায় না, চল।"

বংশী তার তীর ধনুক ঠিক করে নিল আর ঝমরু তার কুড়ুলটা হাতে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছাকাছি আসতেই ওরা শুনতে পেলে কে যেন মিষ্টি সুরে গান করছে। ওরা এগিয়ে যায়। একটু দূর থেকেই ওরা দেখতে পায় খুব সুন্দর একটি মেয়ে পাহাড়ের উপরের খোলা জায়গায় বসে আছে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে খুব জোরালো আলো। ওরা দুজনে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। মেয়েটি সুন্দর সবুজ পাতার পোষাক পরে আছে আর সারা গায়ে ফুলের গয়না, মাথায় ফুলের মুকুট। চার দিক সুগন্ধে ভরপুর। দূর থেকে বংশী আর ঝমরুর মনে হল মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে গান করে করে ভগবানের কাছে কিছু চাইছে। তার একটু পরেই মেয়েটি নাচতে শুরু করে দিল। মেয়েটির সুন্দর নাচ আর গানে আকাশে মেঘ জমে উঠল। গুরু-গুরু, গুম্-গম্ আওয়াজ আরম্ভ হল। মেয়েটি খুশি হয়ে উঠল, নাচতে নাচতে হাত তুলে মেঘেদের ডাকতে লাগল, "এস, এস মেঘ, খুব বৃষ্টি হোক, অনেক অনেক গাছ হোক, সবুজ হোক, সবুজ হোক গাছ পালা, ফুলে আর ফলে ভরে যাক গাছ। চারদিক সুন্দর হোক।"

মেঘেরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "না না পাহাড়ে একটাও গাছ নেই, তোমার ছেলেরা সব গাছ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা সবাই গাছের নরম নরম পাতার ছোঁয়া ভালবাসি, ভালবাসি সবুজ গন্ধের আতর। কিন্তু একটাও গাছ নেই পাহাড়ে। আমাদের গায়ে পাথরের ঘষায় ব্যথা লাগবে, আর রুক্ষ রুক্ষ গন্ধ আমাদের একটুও ভাল লাগে না। আমরা নিচে যাব না, যাব না, বৃষ্টি দেব না।"

নাচ থামিয়ে মেয়েটি করুণভাবে বলে, "তাহলে, তাহলে যে একটাও গাছও হবে না, সবুজ গন্ধের আতরও তৈরি হবে না। দয়া করে নিচে নেমে এস, বৃষ্টি দিয়ে যাও।"

"না, না, না। আমাদের কষ্ট হয়, আমরা যাব না।" গুরু-গুরু, গুম্-

গুম্ ঢাক পেটাতে পেটাতে ওরা চলে যায়। তবু মেয়েটি নাচে আর গান গায়। কিন্তু মেঘেরা ওর নাচ দেখে না, গানও শোনে না, ওরা চলে যায়।

মেয়েটির এত দুঃখ হয় যে ও নিজের গায়ের সমস্ত ফুলের সাজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের কোন চিহ্ন নেই। মেয়েটি বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

এবার বংশী আর ঝমরু আর থাকতে পারে না, আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। বংশী মেয়েটিকে বলে, "মাগো তুমি কে ? এমন ভাবে এই পাহাড়ে এত রাতে একা একা কাঁদছ কেন ?"

ওদের দেখে মেয়েটির কান্না বন্ধ হয়।

মেয়েটি তখন বলে, "আমি কেন কাঁদছি ? আমার ছেলে পুলেরা যা কাণ্ড করছে তার জন্য কাঁদছি। ওরা শুধু আমাকেই কষ্ট দিচ্ছে না নিজেদের কষ্টও ডেকে আনছে। আমি এত দিন ভাবতাম ওরা বোধহয় একদিন নিজেরাই সব বুঝবে। কিন্তু আজও ওরা বুঝল না যে আমার ত সর্বনাশ করছে, নিজেদেরও সর্বনাশ করছে।"

ঝমরু তখন বলে, "কিন্তু তুমি কে তাতো বলছ না। আর তোমার ছেলে পুলেই বা কারা ?"

"আমার নাম বনশ্রী, আমি বনদেবী। বনের গাছপালা, পশু-পাখি, বনের মানুষ, বনের ধারে কাছের মানুষ—সবাই আমার ছেলেপুলে। কিন্তু তোমরা মানুষরা আমার সবচেয়ে সেরা ছেলে। অথচ তোমরাই আমার গাছপালা কেটে, পশুপাখি মেরে নিজেদের সঙ্গীদের শেষ করে ফেলছ।"

"এই যে তুমি" ঝমরুকে দেখিয়ে বনদেবী বলেন, "তুমি যখন গাছ-পালা কাট তোমার প্রত্যেকটি কুড়ুলের ঘা আমার গায়ে লাগে ; আর তুমি" বংশীর দিকে চেয়ে বলেন, "তুমি যখন পশু-পাখি মার আমার যে কি কষ্ট হয় বোঝাতে পারব না। আমি যে মা, নিজের ছেলে মারা গেলে কোন্ মায়ের না দুঃখ হয় বল। তাছাড়া গাছ কেটে কেটে তোমরা আমাকে বিচ্ছিরি করে দিয়েছ, আমার সব শক্তি শেষ করে দিচ্ছ।

আমার গায়ে জোর কমে যাচ্ছে দিন দিন, মেঘেদের ভাল করে ডাকতে পারি না, মেঘেরা আমার নাচ গান দেখে শুনে খুশি হয়ে আর নিচে নেমে আসে না, মিষ্টি সুরে গান করে করে বৃষ্টি দিয়ে আমাকে চান করায় না। কিছু দিন পর একদিকে যেমন বন শেষ হয়ে যাবে তেমনি বৃষ্টিও হবে না, মাটি শুকিয়ে যাবে। একটাও সবুজ গাছ হবে না, এক দানা খাবারও পাওয়া যাবে না, তোমরা মানুষরাই খেতে পাবে না। খেতে না পেলে তোমরা কদিন বাঁচবে।" বলতে বলতে বনদেবী আবার কাঁদতে লাগলেন।

বনদেবীকে কাঁদতে দেখে ঝমরু আর বংশীর খুব কষ্ট হতে থাকে। "আমরা, মা, আর তোমাকে কষ্ট দেব না। আমরা অন্য কোন কাজ করব।" বংশী বলে।

ঝমরু বলে, "তোমার অন্য সব ছেলে-মেয়েদেরও আমরা ভালবাসব। আমরা আর গাছ লতাপাতা কাটব না।"

বংশী বলে, "আমরা আর তোমার বনের পশু-পাখিদেরও মারব না। তবে মা যদি আমাদের কোন ক্ষতি করে, দুষ্টু হয়ে যায় তখন কিন্তু মা আমি তীর চালাব, তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না।" বনদেবী বলেন, "আমার সোনার ছেলেরা, তোমরা সবাই মিলে মিশে থাকলেই আমার ভাল লাগবে, তবে দুষ্টু হলে শাসন করতে হবে বৈকি।"

ঝমরু আর বংশী বনদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে নেমে পড়ে। তারপর দুজন এগোতে থাকে। এগোতে এগোতে ঝমরু বলে, "ভাই বংশী, কাঠ ত কাটব না, খাব কি?" বংশী বলে, "আমিও শিকার করে মাংস বিক্রী করি, বাঘ হরিণের চামড়া বিক্রী করে পয়সা পাই, তাতেই আমার দিন চলে। কিন্তু এখন যে বনদেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এলাম, এখন কি করব ভাবছি।" একটু চুপ করে থেকে ঝমরু বলে, "আমি একটা বুদ্ধি করেছি।"

"কি?"

"ঐ যেখানে বনটা আরম্ভ সেখানে একই জায়গায় বট-অশ্বত্থের দুটো গাছ আছে। আজ ও দুটো গাছকে কাটব ঠিক করেছিলাম।

ওগাছ দুটোতে মস্ত বড় বড় দুটো মৌচাক আছে। ঐ মৌচাক থেকে মধু যোগাড় করে বিক্রী করলে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। একটা থেকে তুমি মধু নেবে অন্যটা থেকে আমি।"

"বাঃ, বেশ বুদ্ধি করেছ ত। চল যাই তাই করি গিয়ে।"

ওরা বট-অশ্বত্থ গাছ দুটোর কাছে আসে। বড় বড় মৌচাক দুটোকে দেখে বংশী ও ঝমরু খুব খুশি হয়। তারপর কাজে লেগে যায়।

খুশি হয় বট-অশ্বত্থ গাছ দুটো। বনদেবীর কথা ত ওরাও শুনেছে।—নাঃ, মানুষটা আর নাকি আমাদের কেটে ফেলবে না, বনদেবীর কাছে কি বলছিল শুনেছিস ত? অশ্বত্থ বলে।

"হ্যাঁ, শুনেছি। এখন থেকে" বট বলে, "আমরাও আর ঝগড়া করব না বুঝলি।"

অশ্বত্থগাছ বলে, "ঠিক, ঠিক আমরাও আর ঝগড়া করব না।"

এমন সময় জোরে বাতাস বইতে শুরু করে। বট-অশ্বত্থ নিজেদের ডালগুলো নেড়ে-চেড়ে একজন অন্যজনকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।